# উৎসর্গ

—ঃ*ঃ—

যিনি শৈশবে আমাদের মাতৃহীন, নারীশূন্য পরিবারে মাতার,
কর্ত্তব্যপালন করিতেন, যাঁহার দেওয়া অন্নে, যাঁহার সরল
স্নেহে আমার শরীর ও মন পুষ্ট হইত, আমার সেই
নিষ্কলঙ্কচরিত্র, চিরকুমার, সহোদর স্বর্গীয়
অশ্বিনীকুমার রায় মহাশয়ের নামে
শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে এই ভক্ত-
চরিত গ্রন্থখানি উৎসর্গ
করা হইল

ত্রয়োদশী তিথি,
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩,
কলিকাতা

প্রণত
শ্রীশরৎকুমার রায়

# মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত

## প্রথম অধ্যায়

### বংশপরিচয়

মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের পৈতৃক বাসভূমি বাটাজোড় বরিশাল জিলার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামটি বরিশাল সহর হইতে সতর মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বরিশাল হইতে মাদারীপুর পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাস্তা আছে সেই রাস্তা এই গ্রামের মধ্যদিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার পার্শ্বে যে খাল আছে সেই খাল দিয়া মাদারীপুর ও বিক্রমপুর অঞ্চলের লোকেরা নৌকাযোগে বাকরগঞ্জের নানাস্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে।*

অশ্বিনীকুমার এই গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্তপরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বকোষের 'কুলীন' শীর্ষক প্রবন্ধপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ আদিশূর দত্তবংশীয়দিগকে তাহাদের বাসের জন্য বাটাজোড় গ্রামখানি অর্পণ করেন, এবং পুরুষোত্তম দত্তের বংশধর নারায়ণ দত্ত মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ে মহাসান্ধিবিগ্রহিক (Secretary of Foreign Affairs) পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাটাজোড়ের দত্ত-বংশীয়েরা এই নারায়ণ দত্তের বংশসম্ভূত। ইহারা বাঙ্গোরোড়া পরগণার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ তালুকদার। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান রাজত্বের সময়ে নবাব সরকারে

চাকুরী করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারের পৈতৃক বাটীতে একটি দীর্ঘিকা আছে। সেইটিকে "মঘের আঁধি" বলা হয়। প্রবাদ আছে যে, মুসলমান নবাবদিগের শাসন সময়ে মঘেরা একরাত্রিমধ্যে ঐ দীঘী কাটিয়াছিল। এক্ষণে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বাটাজোড়ের বিখ্যাত বাজারে সপ্তাহকালব্যাপী "মেলা" বসিয়া থাকে।

অশ্বিনীকুমারের পূর্ব্ব পুরুষ ভৈরবনাথ দত্ত ও তাঁহার পুত্র রতিনাথ দত্ত সপরিবারে বাটাজোড়ে আসিয়া বাস করেন। রতিনাথের পুত্র জয়রাম, তাঁহার পুত্র দুর্গাদাস, দুর্গাদাসের পাঁচ পুত্রমধ্যে একজনের নাম রমাকান্ত; তাঁহার পুত্র গতিনারায়ণ। ইহাঁর বংশধরদিগের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—
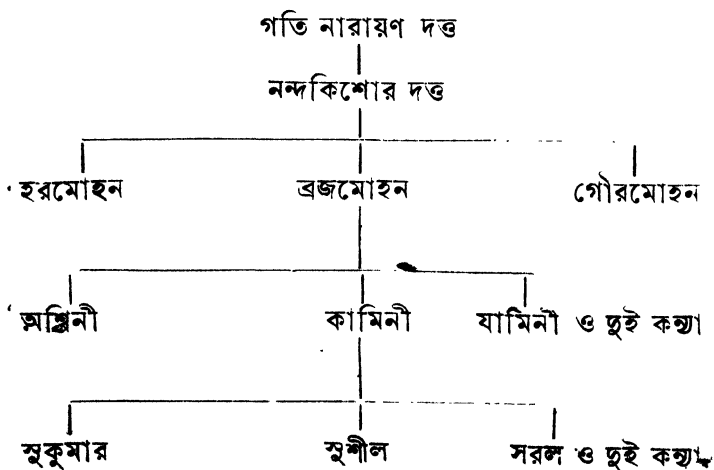
নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক গতিনারায়ণ গ্রামে থাকিয়া স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় সহধর্ম্মিণী তাঁহার সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। নন্দকিশোরও তাঁহার পিতার মত ধার্ম্মিক ছিলেন। জপ-তপেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামবাসীরা সকল বিষয়ে তাঁহার সুপরামর্শ এবং নিরপেক্ষ শালিসী বিচার মানিয়া লইতেন। কনিষ্ঠ পুত্র গৌরমোহন মাদারীপুরে ওকালতী করিতেন।

অশ্বিনীকুমারের জনক ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ১৭৪৭ শকাব্দে ৩রা আশ্বিন রবিবার বাটাজোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন ষোল কি সতর বৎসর তখন পর্য্যন্ত তিনি বাল-সুলভ খেলাধূলা ও আমোদআহ্লাদেই দিন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। একদা পিতার ভর্ৎসনায় ব্যথিত হইয়া অভিভাবকদিগের অজ্ঞাতসারে চট্টগ্রাম সহরে গমন করিয়া তথায় বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি কিছুকাল মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে বরিশাল জিলার নরোত্তমপুর গ্রামের মধ্য ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ইহার পরে তিনি রাজধানী কলিকাতা নগরে গমন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিয়া ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন তিনি কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে ওকালতী করেন। তখন শম্ভুনাথ পণ্ডিত উক্ত আদালতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন।

ব্রজমোহন তাঁহার সহিত একযোগে কার্য্য করিতেন। ১২৬৯ সালে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে শম্ভুনাথ বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এই আসন অলঙ্কৃত করেন নাই। এই সময়ে শম্ভুনাথ তাঁহার বন্ধু ব্রজমোহনকে তাঁহার সমস্ত মামলা দিয়া তাঁহাকে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ব্রজ-মোহনের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিলনা বলিয়া মুন্সেফী পরীক্ষা দিয়া ১৮৪৯ অব্দে মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে বরিশাল জিলানিবাসী কোন হিন্দু ভদ্রলোক সরকারী বিচারকের পদ প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৪৯ হইতে ১৮৮৪ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিচারকের কার্য্য করিয়াছেন।

মুন্‌সেফের পদে নিযুক্ত হইবার পরে তিনি স্বনামধন্য স্বর্গীয় বারিষ্টার মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ মহাশয়দের ভাগিনেয়ী প্রসন্নময়ীকে বিবাহ করেন। প্রসন্নময়ীর পৈতৃক নিবাস বানরীপাড়া গ্রামে। এই দম্পতী ১৮৫৬ অব্দের ২৫এ জানুয়ারী মহাত্মা অশ্বিনীকুমারকে পুত্ররূপে লাভ করেন। এই সময়ে ব্রজমোহন লাউকাঠি চৌকিতে (পটুয়াখালী) মুন্‌সেফী করিতেন, সেই স্থানেই অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। দত্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় পটুয়াখালীতে সব্‌ডিভিসন স্থাপিত হয়। তিনিই তথায় মুনসেফ্, ডেপুটী কলেক্টার ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই তিন পদে কার্য্য করিতেন।

কৃষ্ণনগরে বদ্‌লি হইয়া ব্রজমোহন সদরওয়ালার (ছোট আদালতের জজ) পদ প্রাপ্ত হন। তখন বঙ্গদেশে মাত্র ছয় জন সদরওয়ালা ছিলেন। তাঁহাদের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। ইহাঁরা কেবল হাইকোর্টের অধীন ছিলেন। ব্রজ-মোহন যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন তখন তাঁহার মামাশ্বশুর বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী মনোমোহন, লালমোহন ও মুরারী ঘোষ তথায় ছিলেন। স্বর্গীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীর পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী এবং কৃষ্ণনগর রাজতরফের দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত ব্রজমোহনের প্রগাঢ় হৃদ্যতা ছিল।

ধর্ম্ম ও সুনীতির প্রতি ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের অবি-চলিত নিষ্ঠা ছিল। তিনি তৎপ্রণীত "মানব" নামক গ্রন্থে মানুষের দেহতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া পাপপুণ্যের অতি সুন্দর রূপক ছবি অঙ্কন করিয়াছেন। এই দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকখানি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রেভারেণ্ড কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। উপনিষদ্ ও বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ দৃষ্ট হইত। বারাণসীতে বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য তিনি একটি বৃত্তি প্রদান করিতেন।

পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের এই ধর্ম্মানুরাগ অশ্বিনীকুমারের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নির্ব্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অশ্বিনীকুমার যখন লক্ষ্ণৌ

কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন তখন তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে একপত্রে লিখিয়াছিলেন—

"বাবা বেদান্ত বড় ভালবাস্‌তেন, তাঁর মুখে প্রথম বেদান্তের কথা শুনি। বেদান্ত তাঁর বেশী পড়া না থাক্‌লেও তার মূল কথা বড় ভালবাস্‌তেন। আর উপনিষদ্ পড়তেন। উপনিষদের কিরূপ ভক্ত ছিলেন তা আজ মনে পড়্‌চে। তাঁর কাছে ছেলেবেলা বেদান্তের কথা শুনেছিলাম বলে আজ বেশ কাটাতে পারিচি। আর মনে সুখ হয় যে তাঁর ঘরে জন্মেছিলাম।"

কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া ব্রজমোহন নিজ জিলা বরিশালেই স্থায়িভাবে বাস করিতেন। তাহার অভিপ্রায় মতে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার নামে ১৮৮৪ অব্দের ২৭এ জুন একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ব্রজমোহন স্ত্রীশিক্ষারও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার নামে এখনও প্রত্যেক বৎসর উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ৪০টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। শেষ জীবনে তিনি তীর্থভ্রমণ করিয়া অনেক সময় কাটাইতেন। ১৮৮৬ অব্দের ৩১এ জানুয়ারী তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া তিনি সন্ন্যাসরোগে মানবলীলা সংবরণ করেন।

অশ্বিনীকুমারের জননী প্রসন্নময়ী উচ্চকুলোদ্ভূতা ও নানা সদ্‌গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহার মনের বল অসাধারণ ছিল। প্রসন্নময়ীর কনিষ্ঠ পুত্র যামিনী কুমার বি, এ

শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে কলিকাতা নগরে ওলাউঠা রোগে মারা যান। এই সংবাদ যখন বরিশালে পঁহুছে তখন নিষ্ঠাবতী প্রসন্নময়ী ঠাকুরপূজায় ব্যাপৃতা ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া তিনি মনে দারুণ বেদনা পাইলেও বাহিরে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইল না। যথারীতি পূজা শেষ করিয়া তিনি নিয়মিত গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। এই পুণ্যবতী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার জননীর কর্ম্মকুশলতা, সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণ লাভ করিয়া থাকিবেন।

অশ্বিনীকুমারের মধ্যম সহোদর কামিনীকুমার ধীশক্তি-সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। তিনি ইংরাজী সাহিত্য, ফরাসী ও লাটীন ভাষায় এবং ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তৎপ্রণীত "ভালবাসা" নামক একখানি পুস্তক তৎকালে আদৃত হইত। তিনি তাঁহার নাবালক তিন পুত্র ও দুই কন্যা অগ্রজের হস্তে অর্পণ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## অশ্বিনীকুমারের আদ্যজীবন

### পিতার সঙ্গ ও প্রভাব

অশ্বিনীকুমার সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক পিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা জননীর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে বাল্যাবধি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ সৌভাগ্য আমাদের এই অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন দেশে অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে।

পুত্রের মনে যাহাতে কোনরূপ মিথ্যা অভিমান স্থান না পায় তৎপ্রতি শিশুকাল হইতেই পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদা কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রজমোহনের সহিত সাক্ষাৎকার মানসে আগমন করেন। তিনি পুত্র অশ্বিনী-কুমারকে তামাকু সাজাইয়া আনিবার জন্য আদেশ করেন। বলা বাহুল্য পুত্র অম্লানবদনে পিতার আদেশ প্রতিপালন করেন। অশ্বিনীকুমার অন্যত্র চলিয়া যাইবার পরে আগন্তুক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার ভৃত্যের অভাব নাই অথচ আপনি আপনার পুত্রকে তামাকু সাজাইবার জন্য আদেশ করিলেন কেন?" উত্তরে ব্রজমোহন বলিলেন—"আমার ছেলে যাহাতে কোন কাজকে হেয় বলিয়া মনে না করে, এই জন্য আমি তাহাকে যে কোন কাজ করিতে আদেশ করি"

ব্রজমোহন পুত্র অশ্বিনীকুমারের সহিত অবসর সময়ে পুরাণ ও ইতিহাসের নানারূপ গল্প করিতেন। দেশের নানাশাস্ত্র ও জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনায় যাহাতে তাঁহার আগ্রহ জন্মে তীক্ষ্ণধী পিতার সর্ব্বদা তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল। অশ্বিনীকুমারই বলিয়াছেন, ছেলেবেলা তিনি পিতার মুখে বেদান্তের কথাও শুনিয়াছেন। ব্রজমোহন তাঁহার পুত্রকে কদাচ কুসঙ্গে মিশিতে দিতেন না। পুত্রের সঙ্গীরা যাহাতে সচ্চরিত্র হয়, তৎপ্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ ছিল। অতি শৈশবেই উহার চিহ্ন দেখা গিয়াছে। ঘট পাতিয়া ঠাকুর পূজা করা তাঁহার শৈশবের খেলা ছিল। শিশু বয়সে তিনি কাগজের ঢোলক বাজাইয়া হরিতলায় হরিনাম করিতেন।

ব্রজমোহন যখন রংপুর সহরে মুন্‌সেফী করিতেন তখন অশ্বিনীকুমার সেখানকার উচ্চ ইংরাজী স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়িতেন। ঐ সময়ে একদা রাত্রিকালে সহরে বাঘ ডাকিতেছিল। অশ্বিনীকুমার পিতার সহিত এক শয্যায় শুইয়াছিলেন। বাঘের ডাক কিরূপ উহা শুনাইবার জন্য তিনি অশ্বিনীকুমারকে ডাকিয়া জাগাইলেন। অশ্বিনীকুমার বাঘের ডাক শুনিলেন। পিতা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার আর ঘুম হইল না। তিনি বলিয়াছেন—“ঐ দিন আমার মনে এক অদ্ভুত ভাবোদয় হইয়াছিল। আমি

শুনিয়াছিলাম মানুষ কখন কখন বাঘ হয়। বাবার কোলের মধ্যে শুইয়া আমার মনেও বার বার এই কথা জাগিতেছিল—বাবা তো বাঘ নয়?"

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখন মফঃস্বলের নগরসমূহের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতায় কৃষ্ণনগরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। ব্রজমোহন বহুবৎসর কৃষ্ণনগরের সদরওয়ালা ছিলেন। উক্ত নগরে বসবাসের জন্য তিনি একখানি পাকা বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারের বাল্য ও কিশোরকাল কৃষ্ণনগরেই অতিবাহিত হয়। অশ্বিনীকুমার কৃষ্ণনগর স্কুল ও কলেজ হইতে প্রবেশিকা, এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার পিতার এমন সস্নেহ তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন যে, কোন প্রকার কলুষতা তাঁহার চরিত্র স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি আমাদিগকে ইহা বলিতেন—"পাপ কি, আমার বালক বয়সে আমি তাহা ধারণাই করিতে পারিতাম না।" ইহা হইতে কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ব্রজমোহন তাঁহার পুত্রকে অতি কঠোর শাসনের মধ্যে রাখিতেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে কুসঙ্গে মিশিতে দিতেন না কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বাধীনতার আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। সুরসিক ব্রজমোহন পুত্রদের সহিত নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ করিতেন। অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন—

"পিতাঠাকুর খুব ছড়া কাটিতে পারিতেন। আমরা যখন বরিশাল হইতে নৌকাযোগে বাটাজোড় যাইতাম, তখন কখন কখন আমাদিগকে তাঁহার সহিত ছড়া কাটিতে হইত। তিনি বলিতেন—

পশ্চিমে ডুবিছে সূর্য্য লোহিত বরণ।

কামিনী বা আমি হয়ত পাদপূরণ করিবার জন্য বলিতাম—

আকাশে উঠিছে ঐ তারা অগণন॥

এইরূপ ছড়া কাটিয়া, গল্প করিয়া তিনি আমাদিগকে প্রচুর আমোদ দিতেন। পিতার সহিত বাক্যালাপে অশ্বিনীকুমার কতখানি স্বাধীনতা পাইতেন, তদ্বিষয়ে আর একটি আখ্যান সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে শুনিতাম। তিনি বলিয়াছেন—

"আমি কাপড়ে চোপড়ে ও নানাপ্রকারে যত টাকা খরচ করিতাম, আমার পিতা তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতেন। ঐ ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, "দেখ, এখনও আমি নিজের জন্য অত টাকা খরচ করি না।" আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"তাহা তো হইবেই।" পিতা বলিলেন 'কেন?' আমি বলিলাম—'আপনি বা কে, আর আমি বা কে, আপনি বাটাজোড়ের কোন-এক নন্দকিশোর দত্তের ছেলে, আর আমি সদরওয়ালা ব্রজমোহন দত্তের ছেলে।"

ব্রজমোহন দত্ত পুত্রদের সহিত যেমন অভিভাবক, তেমন বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। ছোট একটা আখ্যান হইতে

ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারিবে। একদা তিনি নৌকাযোগে পুত্র অশ্বিনীকুমারের সহিত যাইতেছিলেন। তিনি আপন মনে একটী গান রচনা করিয়া গাহিতেছিলেন। পিতাকে গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে শুনিয়া অশ্বিনীকুমার মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেছিলেন। পিতা ব্রজমোহন তখন পুত্রকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"আমি কি গাহিতেছি শুন্‌বি? আমি স্বরচিত একটি গান গাহিতেছি— 'মদন রাজার দরবারে আর কার্য্য নাই' ইত্যাদি।" তখন তিনি পুত্রকে ঐ গানের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন। কামরিপু দমন-বিষয়ক উপদেশ-বাক্য তিনি অসঙ্কোচে পুত্রকে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক পিতার প্রদত্ত এই শিক্ষা ছাত্রাবস্থায় অতি উগ্রভাবেই অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যখন কলিকাতায় ছাত্রাবাসে থাকিয়া এম, এ, পড়িতেন, তখন একদিন অপরাহ্ণ-ভ্রমণের পরে আসিয়া বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেনের (স্বনামখ্যাত অধ্যাপক) মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার ঘরে দুইটি ছাত্র অতি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমার ঐ ঘরের সমস্ত দ্রব্য, মেজে, দেওয়াল প্রভৃতি দুই তিনবার উত্তমরূপে ধুইয়া শোধন করিয়া পরে ঐ ঘর ব্যবহার করিয়াছিলেন। অশ্লীলতার প্রতি সেই সময়েই তাঁহার এমনই বিদ্বেষ ছিল।

## পুণ্য ও প্রেমের জয়

তিনি যখন চৌদ্দবৎসরের বালক তখনই তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও নৈতিকতেজ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বীয় নাম গোপন করিয়া "ভক্তিযোগে" তিনি এই ঘটনাটি প্রকাশ করিয়াছেন—

একটি বালক চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় মাতাপিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন একস্থলে বাস করিতেছিল। সেইস্থলে যাহাদিগের বাড়ীতে থাকিত, তাহারা প্রায় সকলেই ইন্দ্রিয়াসক্ত ও সুরাপায়ী। কেহ কেহ তাঁহার সম্মুখে বসিয়াই অনেক সময়ে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া সুরাপান করিত। গৃহস্বামী বাড়ীতে বেশ্যা আনিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। একদিন কতকগুলি লোক সুরাপান করিতেছে এবং বালকটির নিকটে সুরার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ পান করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছে। তাহাদিগের বাক্য শুনিতে শুনিতে বালকটির সুরাপানে ইচ্ছা জন্মিল। ক্রমে সে সুরাপাত্র ধরিবার জন্য হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিল। যেমন হস্ত বাড়াইবে অমনি তাহার বিদেশস্থ এক প্রাণের বন্ধুর (স্বর্গীয় ভুবনেশ্বর গুপ্ত) ছবি মনে পড়িল। সেই বন্ধুটির প্রতি ইহার গাঢ় অনুরাগ, দুজনে একত্র অনেক সময়ে সুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মনে হইল আমি কি করিতে যাইতেছি। আমি আজ সুরাপান করিলে কি তাঁহার

নিকট গোপন রাখিতে পারিব ? প্রকাশ করিলে সে কি আর আমায় ভালবাসিবে ? একদিকে সুরাপানের মোহময় প্রবল প্রলোভন, অপর দিকে প্রেমের পবিত্র আকর্ষণ, কিঞ্চিৎ কাল পরে সংগ্রামে প্রেমেরই জয় হইল।"

এই সময়কার আর একটি ঘটনা অশ্বিনীকুমার তৎপ্রণীত "ভক্তিযোগ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঘটনাটি এই—

একস্থানে দুইটি যুবক বাস করিত। একটি স্কুলে, অন্যটি কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পড়িত। একদিন কোন কারণবশতঃ উভয়ের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। পরদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া স্কুলের ছাত্রটিকে কলেজের ছাত্রটির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। ছাত্রটি বলিল—"আমি কোন অপরাধ করি নাই, যদি করিয়া থাকি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" এই বলিয়া সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল। ছাত্রটি প্রত্যহ যুবকটির বাড়ী যাইত। কিন্তু বিবাদ হওয়ার পরে সে আর যায় না। ইহাতে যুবকটির যারপরনাই কষ্ট হইতে লাগিল। সে যখনই উপাসনা করিতে বসিত তখনই তাহার মনে পড়িত, ভক্ত যীশু বলিয়াছেন—"যদি তুমি তোমার নৈবেদ্য নিবেদন করিবার জন্য বেদীর নিকটে আনিয়া থাক এবং সেই সময়ে তোমার মনে পড়ে কোন ভ্রাতা তোমার প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আগে যাও, তাঁহার সহিত মিলন করিয়া আইস, পরে তোমার নৈবেদ্য নিবেদন করিও।" সে ভাবিত,

যতক্ষণ না সে যুবকটির সহিত মিলন করিবে, ততক্ষণ ভগবান্ তাহার প্রার্থনা কি স্তবস্তুতি গ্রাহ্য করিবেন না। তিনি প্রেমময়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অপ্রেম থাকা পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার নাই। ইহাই ভাবিয়া সে অধীর হইয়া পড়িত। এদিকে তাহার জ্বর হইয়াছে সুতরাং সে অপর যুবকটির নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না। যাই জ্বর আরোগ্য হইল, অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"ভাই, আমাদের মধ্যে মিলন হওয়া প্রয়োজন, কেন এরূপ অপ্রেমের ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিব?" সে নিতান্ত বিরসমুখ হইয়া বলিল—"তাহা হইবে না, কাচ ভাঙ্গিলে কি আর তাহা জোড়ান যায়?"

এই বাক্য শুনিয়া সে দিবস তাহাকে নিরস্ত হইয়া আসিতে হইল, বলিয়া আসিল, "আমি পুনরায় কাল উপস্থিত হইব, প্রত্যেক দিন আসিব, যে পর্য্যন্ত পুনরায় মিলন না হয়।" তাহার পরদিন পুনরায় সে বাড়ীতে উপস্থিত হইল, কিন্তু এদিবস আর তাহাকে বাড়ীতে পাইল না। পরদিন যে স্কুলে সেই যুবকটি পড়িত সেই স্কুলে এক সভা ছিল। ছাত্রদিগের অনুরোধে অপর যুবকটি তথায় উপস্থিত হইল। একটি ছাত্র রচনা পাঠ করিল। তাহার পাঠ শেষ হইলেই যাই সেই রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার অনুরোধ হইল, অমনি একটি ছাত্র দাঁড়াইয়া বলিল—"অদ্য আমরা এস্থলে রচনা শুনিতে কি তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ

করিতে উপস্থিত হই নাই, আমাদিগের কোন বন্ধুর অনুরোধে সভায় উপস্থিত হইয়াছি। তাহার নাকি কি বক্তব্য আছে।" এই ছাত্রটির বাক্য শেষ হইবা মাত্র সেই ছাত্রটি উঠিয়া বলিতে লাগিল—"ইহারা সকলে আমার অনুরোধে এখানে উপস্থিত। সে দিন হয়ত কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, আমি—বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছি, তাহা চাহি নাই, চাহিবার কোন কারণ নাই।' এইরূপ বলিয়া তাহার প্রতি কতগুলি কটূক্তি করিতে লাগিল! শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন ভাবিলেন, কিন্তু কলেজের ছাত্রটি তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করায় তাহা পারিলেন না। আজ সে দৃঢ় হইয় আসিয়াছে, মিলন করিতেই হইবে। যাই স্কুলের ছাত্রটি বসিল অমনি কলেজের ছাত্রটি উঠিয়া পুনরায় মিলন প্রার্থনা করিল। স্কুলের ছাত্রটি ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—

মিলন, মিলন হইতেই পারে না। Reconciliation, reconciliation can not take place. এই কথায় বিন্দুমাত্র সংক্ষোভিত না হইয়া কলেজের ছাত্রটি প্রেমের মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিল এবং তাহার নিকট আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার প্রাণস্পর্শী কথাগুলি সকলকে আকুল করিয়া তুলিল। বক্তা ও শ্রোতা সকলেরই চক্ষু প্রায় জলে পরিপূর্ণ। স্কুলের ছাত্রটি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া টেবিলের উপর হইতে আপনার পুস্তকগুলি তুলিয়া লইল।

তখন কলেজের ছাত্রটি আরও মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া বলিল—" কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, চলিয়া যাইও না, আমার এই কয়েকটি কথা শুনিয়া যাও, আমাকে ক্ষমা কর, নির্দ্দয় হইও না।" এইরূপে করুণস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কত কি বলিতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল স্কুলের ছাত্রটি বুঝি তাহার কথা শুনিতে চায়না বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া সভা হইতে চলিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রেম সর্ব্বজয়ী, তাহার সেই মিলনের মিষ্ট কথাগুলি তাহার প্রাণে লাগিয়াছে আর সে থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বক্তার নিকটে গিয়া তাহার দুখানি হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, আমায় ক্ষমা করুন বলিতে বলিতে অস্থির হইয়া পড়িল। এই মিলন আর কখনও বিরোধের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয় নাই।

## মিথ্যাচরণের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

বাল্যকাল হইতে অশ্বিনীকুমার উপাসনাশীল ছিলেন। বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেন ও ভুবনেশ্বর গুপ্তকে লইয়া তিনি একটি উপাসনা সমিতি করিয়াছিলেন। এই সভায় তাঁহারা তিন-জনে পালাক্রমে উপাসনা করিতেন। যিনি সত্যস্বরূপ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, যিনি অনন্ত ইঁহারা সেই শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন।

এইরূপ উপাসনার ফলে অশ্বিনীকুমারের শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সত্যের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অতি সামান্য মিথ্যা, সামান্য

অপবিত্রতাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইত। নিজের জীবনের একটি মিথ্যা এই সময়ে তাঁহার কাছে উজ্জ্বলরূপে ধরা পড়িল। তখন পরীক্ষার্থীর বয়স ষোল না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া যাইত না। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়ে অশ্বিনীকুমারের বয়স অনুমান চৌদ্দ বৎসর ছিল। এক্ষণে সাধারণতঃ যাহা করা হয় তাঁহার বেলাও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। এফ এ পাশ করিবার পরে এই বিষয়টির অসত্যতা তাঁহার বুদ্ধিগম্য হইল। ধর্ম্মশীল অশ্বিনীকুমার মিথ্যাদ্বারা স্বীয় জীবন কলঙ্কিত হইল ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তাহার মনে এই প্রশ্ন উঠিল,—এই মিথ্যাকে নীরবে মানিয়া লইলে আমি কেমন করিয়া সত্যস্বরূপ দেবতার আরাধনা করিব? মিথ্যাচরণ ও ঈশ্বরোপাসনা এই দুইয়ের সামঞ্জস্য হইতেই পারেনা।" এই মিথ্যা সংশোধনের জন্য তিনি তাঁহার মনোভাব প্রথমতঃ কলেজকর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় সত্যনিষ্ঠ যুবকের বক্তব্য শুনিয়াও কিছু প্রতিকার করিলেন না। কিন্তু এই মিথ্যাচরণের জ্বালা অসহ্য হওয়ায় অশ্বিনীকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের সহিত দেখা করিয়া বয়স সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি যুবককে বলিলেন —"এখন এই বিষয়টি হাতছাড়া হইয়াছে, আর কিছু করিবার সাধ্য নাই।" অশ্বিনীকুমারের এই আচরণকে পাগলামি মনে করিয়া তিনিও তাঁহাকে থামিয়া যাইবার জন্য মিষ্ট বাক্যে উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

এই সময়ে তিনি মনের দুঃখে চারিটি মাত্র পয়সা সম্বল করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। পরে বর্দ্ধমান সহরে ধৃত হইয়া কৃষ্ণনগরে নীত হইয়াছিলেন। মিথ্যা বয়স লিখনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই সময়ে তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল পাঠে বিরত ছিলেন। সত্যের প্রতি অশ্বিনীকুমারের অনুরাগ কিরূপ দৃঢ় ছিল, ছাত্র জীবনেই এইরূপে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

## পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদের সংসর্গ

যাঁহাদের পুণ্যচরিত্রের প্রভাব অশ্বিনীকুমারের জীবন-পথের অমূল্য পাথেয়, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী এবং ঋষিতুল্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার ছাত্র ছিলেন কিনা ঠিক বলিতে পারি না, তবে তিনি তাঁহাকে গুরুর অধিক আন্তরিক ভক্তি করিতেন। অশ্বিনীকুমার লাহিড়ীমহাশয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠা, নৈতিক তেজ ও সত্যানুরাগ স্বীয় জীবনে নিঃসন্দেহে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

লাহিড়ীমহাশয় সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার পরম শ্রদ্ধা সহকারে নানা কথা বলিতেন। তাহাদের মধ্যে একটি আখ্যান তিনি তৎপ্রণীত ভক্তিযোগ গ্রন্থে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"আমি এক মহাত্মাকে জানি, তিনি গৃহস্থ।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মেডিকেল কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেন, অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন; এই পুত্র বৃদ্ধের ভরসাস্থল। বোধহয় পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে দিন মৃত্যু হয়, তাঁহার বাড়ীতে আমাদিগের একটি সভা ছিল। আমার দুইটি সহাধ্যায়ী সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, বৃদ্ধ কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কি আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা দুইজনে নিকটে এক আসনে বসিলেন। তন্মধ্যে এক জন কিঞ্চিৎ পরে উঠিয়া যে ঘরে আমাদের সভা হইত সেই ঘরের দিকে চলিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিজন্য ও ঘরে যাইতেছেন? তিনি উত্তর করিলেন, 'এডুকেশন গেজেট আনিবার জন্য।' বৃদ্ধ স্থিরভাবে বলিলেন—"ও ঘরে যাইবেন না, ও ঘরে আমার ন—আজ এই চারিটার সময়ে মরিয়াছে।" আমার সহাধ্যায়ী ত শুনিয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ।' একি! এইরূপ যোগ্য পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, বিন্দুমাত্র কাতরতা নাই, এরূপ দৃশ্যত আর কখনও দেখা যায় নাই, একেবারে অবাক্, নীরবে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, 'আজ চলুন, আমরা দেওয়ানের বাড়ীতে সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসি।" যাঁহার প্রাণ ভগবদ্‌ভক্তিতে পূর্ণ নহে তিনি কি দুঃখের মধ্যে এমন স্থির থাকিতে পারেন?

অশ্বিনীকুমার ছাত্রজীবনে এমন ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার সাহচর্য্য করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লাহিড়ীমহাশয়ের জীবনের আর একটি ঘটনা অশ্বিনী-কুমারকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। ঘটনাটি তিনি অনেকের নিকট নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।—লাহিড়ী মহাশয় একদিন কলিকাতা নগরের রাজপথে এক ফুটপাথ দিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতেছিলাম। কি ভাবিয়া হঠাৎ লাহিড়ী মহাশয় ব্যস্ততার সহিত দ্রুতপদে অপর ফুটপাথে যাইয়া এক গলির মধ্যে প্রবেশ করেন। আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া গলির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার হঠাৎ এ কি হইল? আপনি এমন ব্যস্ততার সহিত এই গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন কেন? তিনি তখন অপর ফুটপাথের একটি লোককে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—'ঐ লোকটির কাছে আমি কিছু টাকা পাই। যখনই দেখা হয় ও ওয়াধা করে, কিন্তু সে ওয়াধা রক্ষা করে না। ওয়াধা করিয়া তাহা রক্ষা না করিলে যে মিথ্যা বলা হয়, এই বোধ উহার নাই। আজ দেখা হইলে ওয়াধা করিয়া মিথ্যাচরণ করিত। আমার উহা সহ্য হয় না। উহাকে ঐ মিথ্যাচরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি এইরূপ ভাবে পলায়ন করিয়াছি।

অশ্বিনীকুমার এই যে মহাত্মার সঙ্গ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি মিথ্যাচরণকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন তাহা এই ঘটনায় সুস্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। সত্যের যে বিমল

জ্যোতিঃ অশ্বিনীকুমারের হৃদয় আলোকিত করিয়াছিল, সেই শিখা তিনি মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সংসর্গে লাভ করিয়া থাকিবেন ইহা অসম্ভব নহে।

লাহিড়ীমহাশয়ের তেজস্বিতার এক আখ্যান আমরা বহুবার অশ্বিনীকুমারের মুখে শুনিয়াছি। লাহিড়ী মহাশয় যখনকৃষ্ণনগরে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন তখন ছোট লাট স্যর রিভারটম্‌সন্ একবার তথায় পরিদর্শনোপলক্ষে গমন করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা বাহাদুর লাট্ সাহেবের সংবর্দ্ধনার্থ এক সভার আয়োজন করেন। আহূত হইয়া লাহিড়ী মহাশয় ঐ সভায় গমন করেন। লাহিড়ী মহাশয় স্যার রিভারটম্‌সনের পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই লাট্ সাহেব করমর্দ্দনার্থ হাত বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু লাহিড়ীমহাশয় কি করিলেন? তিনি হঠাৎ দক্ষিণ হস্তখানি গুটাইয়া পশ্চাতে লইয়া গিয়া বলিলেন।—"যে ব্যক্তি ইল্‌বার্ট বিলের পক্ষে মত দিয়া থাকেন আমি তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করি না।"

অশ্বিনীকুমার ছাত্রাবস্থায়ই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের স্নেহাস্পদ হইয়াছিলেন। অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, অশ্বিনীকুমার সকল সম্প্রদায়ের সাধুমহাত্মাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন। বন্ধুরা অনেক সময়ে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন—অশ্বিনী বাবু 'ইব্রাহিম' ধর্ম্মাবলম্বী। অর্থাৎ তিনি ঈশার ভক্ত, ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী, হিন্দুধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেন, একেশ্বরবাদী মুসলমানদের ধর্ম্মেরও প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তাঁহার এই সর্ব্বধর্ম্মানুরাগ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সংসর্গ হইতে পাইয়া থাকিবেন। অশ্বিনীকুমারের মুখে শ্রুত আছি—

বসুমহাশয় সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে গীতা, উপনিষদ্, বাইবেল, কোরাণ, হাফেজ, শিখদের ধর্ম্ম পুস্তক, কবীরের উপদেশ, Leigh Hunt's Religion of the Heart প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক সাজাইয়া রাখিতেন। তিনি বলিতেন—এই সকল পুস্তক আমার 'অভিনব গ্রন্থ সাহেব'।

অশ্বিনীকুমার মৃত্যুর অনেক বৎসর পূর্ব্বে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগের পর আনন্দধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এই অসুস্থতা কদাচ তাঁহার চিত্তের শান্তি এবং হাস্যসুন্দর মুখের চিরপ্রসন্নতা নষ্ট করিতে পারে নাই। সুখে, দুঃখে তিনি আনন্দময় দেবতার উপর নির্ভর করিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেন। অশ্বিনীকুমারের মুখে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি অনুরূপ আখ্যান শুনিয়াছি—

ভক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজগৃহে গিয়াছিলাম। বসু মহাশয় তিন মাস যাবৎ অর্দ্ধাঙ্গ বাতব্যাধিতে ভুগিতে ছিলেন। সুতরাং আমি গম্ভীর মুখে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করি। অভিবাদন করিবা মাত্র তিনি উৎফুল্ল হইয় উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"কি হে অশ্বিনী, এস, এস, কত দিন

তোমায় দেখিনা।” এই বলিয়া এক হস্তেই আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। অপর হাতখানি তখন অবশ। তারপরে তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন। সেলি, বাইরণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, হাফেজ, গীতা, উপনিষদ্ হইতে যেমন খুসী শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁর কি আনন্দ, কি ভাবোচ্ছ্বাস। সেই মধুর বাক্য শুনিতে শুনিতে মহানন্দে তিন ঘণ্টা যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। বিদায়ের সময়ে আমি বলিলাম, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার অসুখ দেখিতে আসিয়াছিলাম বলিয়া গম্ভীর মুখে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম. কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, আপনার আনন্দ আর ধরে না, তিন মাস বিছানায় পড়িয়া আছেন, আপনার কি কষ্ট বোধ হয় না? তখন তিনি উত্তর করিলেন---‘অশ্বিনী, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, যাঁর কৃপায় এত বছর কত সুন্দর দৃশ্য, কত সুন্দর স্থান দেখিয়া অবর্ণনীয় আনন্দ পাইয়াছি, তাঁর ইচ্ছায় কি কয়েকটা বছর সন্তুষ্টচিত্তে রোগশয্যায় শুইয়া থাকিতে পারিব না?’ অশ্বিনীকুমার এমনই সোণার মানুষের ছোঁয়া পাইয়া স্বয়ং সোণা হইয়াছিলেন।

আধুনিক বরিশালের সৃষ্টিকর্ত্তা অশ্বিনীকুমার যে বরিশাল নগর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন, উহার মূলেও রাজনারায়ণ বসুমহাশয়ের আদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বসু মহাশয় অশ্বিনীকুমারকে বলিয়াছিলেন—“অশ্বিনী, যদি কাজ

করিতে চাও বরিশালে থাকিও, আর যদি খুব নাম করিতে চাও, কলিকাতায় আসিও ।”

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অশ্বিনীকুমারের বাল্য ও কৈশোর কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত হইয়াছে। এই নগরে স্যর আশুতোষ চৌধুরী, ৺ শরৎকুমার লাহিড়ী, ৺ লালমোহন ঘোষ, ৺ মনোমোহন ঘোষ এবং তাঁহার স্নেহাস্পদ ছাত্র ও সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহিত তিনি পরিচিত হন।

১৮৭৮অব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অশ্বিনী কুমার কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে এম, এ পড়িতেন এবং টনিসাহেব, রো সাহেব প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই সময়ে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংস্রবে আইসেন। তাঁহার প্রভাবই অশ্বিনী কুমারকে বঙ্গদেশে সমাজসংস্কারক এবং ছাত্রমহলে সুনীতির প্রতিষ্ঠাতৃরূপে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কেশবের কাছে “ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা ” পাইয়াই অশ্বিনীকুমার ‘আগুনের হল্‌কা’ হইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন বলিয়াই স্বদেশীর যুগে তিনি গাহিতে পারিয়াছিলেন—

অগ্নিময়ী মাগো আজি ডাকি সকলে মা !<br>
জগৎজোড়া ঐ যে আগুন, এক ফিন্‌কি দে তার মা।

ঐ আগুনের একটু পেলে,
এই মরা প্রাণ উঠ্‌বে জ্বলে,
রুদ্রদীপ্ত তেজোঽনলে
পুড়ে হব সোণা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

বিকট ভীষণ দৈত্যবংশ
ঐ আগুনে মা করব ধ্বংস
পাষণ্ড অসুর হীন নৃশংস
ধরায় রাখ্‌ব না।
ওগো, মা, মা, মা।

অশ্বিনীকুমার যখন কলিকাতায় এম, এ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখনকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমরা বহুবার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—"আমার বয়স যখন ১৯ কি ২০ তখন একদিন হঠাৎ আত্মচিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, এই বয়সেই আমি অন্ততঃ উনিশ রকমের পাপ করিয়াছি। নিজের এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া আমার অন্তর আত্মা শুকাইয়া গেল। চিত্তের স্ফূর্ত্তি দূর হইল। সে দিন আর কোন কাজে উৎসাহ রহিল না। সমস্ত দিনটা নিরানন্দে কাটিয়া গেল। সে দিন রবিবার ছিল। অপরাহ্নে ত্রিগুণা ও ভুবনেশ্বর আসিয়া বলিল—'চল, সমাজে যাইবে চল'। আমার মন এমন অবসন্ন ছিল যে, সমাজে যাইবার জন্য কোনরূপ উৎসাহ বোধ করিতেছিলাম না। ত্রিগুণা একরূপ টানাটানি করিয়া আমাকে লইয়া গেল। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই শুনিলাম, সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় গাহিতেছেন—

"ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর
আশা কর নিরাশ হইও না।"

গান শুনিয়া আমি যেন নব জীবন পাইলাম। এ যেন আমাকেই বলা হইতেছে। ভগবান্ আমাকে আশা দিতেছেন। উপাসনান্তে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমি মনের আনন্দে বন্ধুদের পৃষ্ঠে গুম্ গুম করিয়া কীল মারিতে লাগিলাম।

তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, ব্যাপার কি ? আমি বলিলাম, "কীল খাবি না ? আমায় নিয়ে গিয়েছিলি মরা, আর আমি বেরিয়ে এসেছি জ্যাতা।"

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বলেন, "অশ্বিনী-কুমার ধর্ম্মজীবনে উন্নত ছিলেন। আমরা যখন ছাত্রজীবনে মির্জ্জাপুরে ছাত্রাবাসে থাকিতাম, তখন তিনি এক সময়ে প্রত্যহ আমাদের ছাত্রাবাসে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী প্রার্থনায় আমরা মোহিত হইতাম। ছাত্রাবাসে সর্ব্বদা যেন ধর্ম্মের সমীরণ প্রবাহিত হইত। আমাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহ থাকিতেন। তাঁহার চিত্ত ভাবে এমন মাতোয়ারা হইয়াছিল যে, আকাশে মেঘ উঠিলে তিনি ছাদে যাইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতেন।"

অশ্বিনীকুমার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবকে তিনি 'রসের সাগর' বলিয়া বর্ণনা করিতেন। শিক্ষা-জীবনে এই সকল পরম ভাগবত সাধুমহাত্মাদের কৃপা লাভ করিয়াই অশ্বিনীকুমার স্বয়ং পরম ভক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

### যশোহরে ধর্ম্মসভায় শাস্ত্রব্যাখ্যা

পঠদ্দশায় অশ্বিনীকুমার যশোহরে কিয়ৎকাল পিতার সহিত দর্শন ও উপনিষদ্ আলোচনা করেন। অশ্বিনীকুমার বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমারের সংস্কৃত ভাষায় ও বিবিধ শাস্ত্রে কিরূপ গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল তৎপ্রণীত 'ভক্তিযোগ', 'কর্ম্মযোগ', ও 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' প্রভৃতি পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। ব্রজমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত অশ্বিনীকুমারের সংস্কৃত শাস্ত্রালাপ হইত। তিনি বলেন, "অশ্বিনীকুমার সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ আমার সহিত কিছুকাল সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিতেন। তিনি অনর্গল নির্ভুল সংস্কৃত বলিতে পারিতেন। অশ্বিনীকুমার শ্রীমদ্‌ভাগবত, উপনিষদ্‌সমূহ, এবং ঋগেদ প্রভৃতি এমন সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা শুনিয়া সাধারণে ঐ সকল গ্রন্থের অর্থ বুঝিত এবং রসাস্বাদন করিয়া মোহিত হইত। অশ্বিনীকুমারের অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ছিল। ইংরাজী, সংস্কৃত, পার্শী, বাঙ্গলা সকল ভাষার সুন্দর দীর্ঘ কবিতা একবার মাত্র পড়িয়া তিনি নির্ভুল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। নারদ ও শাণ্ডিল্যঋষি-প্রণীত সূত্রগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।"

অশ্বিনীকুমারের বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন তিনি যশোহরে "সাধারণ ধর্ম্মসভা" স্থাপন করিয়া তথায় স্বয়ং উপাসনা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। ১৮ বৎসর বয়সের তরুণ যুবকের প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া সভায় কখন হাসি কখন ক্রন্দনের রোল উঠিত। ৬০।৭০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ শ্রোতারা এই যুবকের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইতেন এবং

অসঙ্কোচে তাঁহাকে পাপ কি, পুণ্য কি, ত্রিতাপ কি ইত্যাকার বহু প্রশ্ন করিতেন। অশ্বিনীকুমার সকলের প্রশ্নাবলীর সদুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাদের বিস্ময়োৎপাদন করিতেন।

এই ধর্ম্মসভার এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে তথায় সার্ব্বভৌম ধর্ম্মই প্রচারিত হইত। উক্ত সভায় এক ইয়ুরোপীয় ধর্ম্মযাজক খৃষ্টধর্ম্ম, জনৈক পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্র এবং এক মৌলবী এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এবংপ্রকার বৈচিত্র্যই ঐ ধর্ম্মসভার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

## কৃষ্ণনগর ও চাত্‌রায় শিক্ষকতা

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমার অল্প দিনের নিমিত্ত কৃষ্ণনগর ও শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাত্‌রা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর স্কুলে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। উত্তরকালে ইহাঁরা যথাক্রমে ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইয়া অশ্বিনীকুমারের সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন।

উনিশ বৎসর বয়সে অশ্বিনীকুমার যখন চাত্রা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া তথায় গমন করেন, তখন ঐ স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ছাত্রগণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল। তাহারা কুৎসিত বাক্য বলিয়া খুব আমোদ পাইত।

অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের নৈতিক দুর্গতি দেখিয়া বিমর্ষ হইলেন। কিন্তু তিনি কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জানিতেন, নির্দ্দোষ পবিত্র আনন্দের আস্বাদন পায় না বলিয়াই ছাত্রদের মন কুৎসিত আমোদের দিকে প্রধাবিত হয়। অশ্বিনীকুমার তাহাদের মন ফিরাইবার জন্য তাহাদিগকে লইয়া গঙ্গায় নৌকায় বেড়াইতেন, তাঁহাদের সহিত গান বাজনা, আমোদ আহ্লাদ করিতেন। ছাত্রগণ এই সোণার চশমা-পরা ছোট মাষ্টারটিকে পাইয়া বসিল। তাহারা সত্য সত্যই তাঁহার ঘাড়ে চড়িত, পিঠে চাপড় মারিত, দুয়ার ভাঙ্গিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া খাদ্যদ্রব্যগুলি খাইয়া যাইত। অশ্বিনীকুমার এই সমস্ত অত্যাচার সহিতেন, কিন্তু ছাত্রদিগকে কুকথা বলিতে, কুসঙ্গে মিশিতে দিতেন না। একদিন একটি অধিক বয়সের বালক ক্লাসে বসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, "স্যর, স্যর, আপনার বিয়ে হয়েছে ?" অশ্বিনীকুমার বলিলেন —"কেন ?" বালকটি বলিল—"আমার একটি ছোট মেয়ে আছে।" অশ্বিনীকুমার গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। আর একদিন এক ছাত্র বলিল—"স্যর, আপনি আমাদিগকে অশ্লীল বাক্য বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা বড় বিপদেই পড়িয়াছি, কোন্‌টা শ্লীল, কোন্‌টা অশ্লীল অতদূর বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। আপনি ঐ বোর্ডের উপর সমস্ত অশ্লীল শব্দগুলি লিখিয়া দিন, আমরা ঐগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিব, আর কখনও ঐ শব্দগুলি বলিব না। ছোট

ছেলেদেরও ঐগুলি মুখস্থ করাইয়া সাবধান করিয়া দিব, তাহারাও বলিবে না।"

ছাত্রটির উক্ত বাক্য শুনিয়া অশ্বিনীকুমার হাসিয়া ফেলিলেন। ক্লাসে হাসির রোল উত্থিত হইল।

আর একদিন অশ্বিনীকুমার বিদ্যালয় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—স্কুলগৃহের দেওয়ালে সর্ব্বত্র A. K. D (অশ্বিনীকুমার দত্ত) লেখা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আজ আমার প্রতি এ অনুগ্রহ কে করিয়াছেন?" একটি ছাত্র বলিল—"স্যর, এতদিন আমরা দেওয়ালে অশ্লীল কথা লিখিতাম, আজ তাহা লিখি নাই, আজ আপনার নাম লিখিয়াছি।" তখন অশ্বিনীকুমার গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে কে এই কাজ করিয়াছ বল?" একটি ছাত্র উঠিয়া স্বীকার করিল। অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি শাস্তি হইবে বল?" সে বলিল—"আমি স্বহস্তে দেওয়ালের সমস্ত লেখা মুছিয়া দিতেছি।" ছাত্রদের সহিত হেড্‌মাষ্টারের এমন অবাধ মেলামেশা গ্রামবাসীদের আলোচনার বিষয় হইল। বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী নন্দ গোঁসাই মহাশয় বালক হেড্‌মাষ্টারকে ডাকিয়া ধম্‌কাইলেন। কিন্তু মাষ্টার ধমক মানিলেন না। কয়েক মাস মধ্যে ছাত্রদের আশ্চর্য্য নৈতিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া গোঁসাই মহাশয় বিস্মিত হইলেন।

## বিবাহ

অশ্বিনীকুমার যখন কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করেন তখন ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ছোট আদালতের জজ ও ধনী ছিলেন। তিনি পুত্র অশ্বিনীকুমারের বিবাহে খুব ঘটা করিয়াছিলেন। এই বিবাহেই উক্ত অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম ব্যাণ্ডের বাদ্য এবং হাতী আনয়ন করা হইয়াছিল। এই দুই নূতন ব্যাপারে উক্ত বিবাহ লোকসাধারণের মনে খুব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল এবং লোকে বহুকাল পর্য্যন্ত এই বিবাহের গল্পগুজব করিত।

অশ্বিনীকুমারের শ্বশুর বংশ নথুল্লাবাদের 'মিরবহর রায়' বাকরগঞ্জ জিলার অতি পুরাতন ভূম্যধিকারী ও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ বলিয়া পরিচিত।

বিবাহকালে অশ্বিনীকুমারের পত্নী সরলাবালার বয়স অতি অল্প ছিল। স্কুল-কলেজে সুশিক্ষা লাভের সুযোগ না পাইলেও এই বুদ্ধিমতী মহিলাকে 'বিদূষী' বলা যাইতে পারে। মহাত্মা অশ্বিনাকুমার স্বয়ং তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যায় তিনি সুপণ্ডিতা না হইতে পারেন—কিন্তু অশ্বিনীকুমারের মত মনীষী মহাত্মার সংসর্গে এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশ, গুণদাচরণ, নরেন্দ্রনাথ, মন্মথনাথ লাহিড়ী প্রভৃতি তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিগণের সহিত, নানা বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়া তিনি বিবিধ

বিষয়ে যথার্থ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিদ্যার্থীরা পুস্তক পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের যে সকল তীর্থ, নগর ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া থাকে এই ভাগ্যবতী স্বামার সহিত ভ্রমণ করিয়া সেই সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। নূতন তথ্য জানিবার জন্য তাঁহার মনে সর্ব্বদা কি প্রকার একটি কৌতূহল জাগরিত আছে তৎসম্বন্ধে একটি সামান্য আখ্যান মনে পড়ে—একবার তিনি স্বামীর সহিত ধানবাদের সমীপস্থ গোবিন্দপুরে বাস করিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ, গুণদা চরণ, জগদীশ প্রভৃতি কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধুও সেখানে গিয়াছিলেন। অপরাহ্নে তিনি স্বামার সহিত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে নরেন্দ্র নাথ এবং আরও দুই একজন বন্ধু ছিলেন। সেখান দিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড চলিয়া-গিয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন—"এই রাস্তা কোথায় গিয়াছে, ইহাকে গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড্ বলা হয় কেন?" নরেন্দ্র নাথের উপর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার পড়িল। তিনি বলিলেন—"সের শাহের আমলে এই রাস্তা নির্ম্মিত হয়, তখন রেলপথ ছিল না, তখন এই রাস্তা দিয়া সৈন্যেরা যাতায়াত করিত, দেশের বাণিজ্য দ্রব্য এই রাস্তা দিয়া এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে প্রেরিত হইত, লোকে রাজধানী দিল্লীনগরে এই পথে যাইত। ইংরাজরাজ কোন জিনিষ, কোন কীর্ত্তি নষ্ট হইতে দেন না। তাঁহারা এই পুরাতন রাস্তাটিকে যথাসম্ভব, পূর্ব্বের মতই রক্ষা করিয়াছেন। দেশে যদি কখন বিদ্রোহ হয়, বিদ্রোহীরা যদি

রেলপথ নষ্ট করে, তখন এই পথে ইংরাজের সৈন্যও চলিতে পারিবে। নরেন্দ্রনাথ থামিয়া যাইবার পরে অশ্বিনীকুমার বলিলেন, ইনি যাহা বলিলেন তাহা মনে রাখিও, তৎসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, সেকালে কত তীর্থযাত্রী সাধুমহাত্মা এই পথ দিয়া কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের পদরেণু এই পথকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের কেহ কেহ দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, সেই সকল সাধুর দেহাবশেষ এই পথের ধূলার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের পত্নী সরলাবালা বুদ্ধিমতী ও সুশিক্ষিতা। সামাজিক, নৈতিক এবং দেশ-হিতকর সকল প্রসঙ্গই তিনি দক্ষতার সহিত আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু আচারে, ব্যবহারে তিনি চিরদিন লজ্জাশীলা হিন্দুবধূর মতই চলিতেছেন বলিয়া কদাচ স্বামীর সহিত কোন সভায় প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন নাই।

অশ্বিনীকুমারের দাম্পত্য-জীবনের একটি কথা সঙ্কোচের সহিত আমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইল। তিনি বিবাহিত হইয়াও অবিবাহিত চির-কুমারের মত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছেন। সুন্দরী, সাধ্বী, সহধর্ম্মিণীর সহিত আমরণ গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াও অশ্বিনীকুমার ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া যে সংযম ও চরিত্রবল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কল্পনাতীত।

বিবাহের পরে দুই এক বৎসর মধ্যে তিনি এক সময়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে খ্রীষ্টভক্ত সাধু পলের রচনাবলী পাঠ করিতেছিলেন। তন্মধ্যে তিনি বহুস্থানে দৈহিক শুচিতা-রক্ষার বিষয় পাঠ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন। তিনি বিবাহিত, তিনি কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে দৈহিক শুচিতা রক্ষা করিবেন উহাই তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল। তিনি তাঁহার তখনকার মনের ভাব সুদীর্ঘ আটপৃষ্ঠাব্যাপী এক পত্রে পত্নীকে জানাইলেন। তিনি তখন পঞ্চদশবর্ষবয়স্কা বালিকা। পরমেশ্বর যোগ্যের সহিতই যোগ্যের মিলন ঘটাইয়া থাকেন। বুদ্ধিমতা পত্নী অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত পত্রোত্তরে জানাইলেন—"আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, তুমি ধর্ম্মজীবনে উন্নত হইবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা কর, তাহাই করিও। আমি কদাচ উহাতে বাধা দিব না, বরং যতদূর পারি তোমাকে সাহায্যই করিব।"

অশ্বিনীকুমার বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি অবিবাহিত ব্রহ্মচারীর জীবনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন। দেশহিত সাধনের নিমিত্ত অবিবাহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারীর দল গঠনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে ছিল। তাঁহার মনের এই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা তদীয় সুযোগ্য ছাত্র ও বন্ধু শ্রীযুত জগদীশ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় মন্মথনাথ লাহিড়ী, শ্রীযুত নগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জীবনে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার এই আদর্শ অংশতঃ অনেক ছাত্রের জীবনে কার্য্য করিয়া থাকিবে।

## ওকালতী

অশ্বিনীকুমারের পিতা ছোট আদলতের জজ ছিলেন। তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল যে, তিনি মাসিক দুই শত টাকা বেতনের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিতেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অশ্বিনীকুমারকে অনায়াসে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু চাকুরী মাহাত্ম্য দত্তমহাশয় এমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বদা বলিতেন—"আমার বংশে আর কেহ গোলামী করে ইহা আমি ইচ্ছা করি না।" এইজন্য অশ্বিনীকুমারের মন আর চাকুরীর দিকে গেল না। তিনি এলাহাবাদে প্লিডারসিপ্ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশাল সহরে আইনের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিন বৎসরকাল ওকালতী করিয়া তিনি বরিশাল সহরের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় ও দীনবন্ধু সেন ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতেন না। বরিশালের ন্যায় ক্ষুদ্র সহরে আইনব্যবসায় তাঁহার মাসিক আয় চারি পাঁচ শত টাকা হইয়াছিল। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন "তীক্ষ্নধী অশ্বিনীকুমার অনন্যচিত্ত হইয়া আইনের ব্যবসায় করিলে তিনি স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সমকক্ষ হইতে পারিতেন।" কিন্তু যে সত্যনিষ্ঠাহেতু অশ্বিনীকুমার ছাত্রজীবনে কিয়ৎকাল অধ্যয়নে বিরত ছিলেন সেই

সত্যনিষ্ঠাই তাঁহাকে ওকালতী ব্যবসায়ে দীর্ঘকাল নিরত থাকিতে দেয় নাই।

এই ব্যবসায় তাঁহার আদৌ অনুরাগ ছিলনা। শেষটা এমন হইয়াছিল যে, তিনি যেন-তেন প্রকারে কাজ শেষ করিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। অনেক সময় মনে মনে বলিতেন—"মা আমায় ঘুরাবি কত।" অবশেষে যে ঘটনায় তিনি আইনের ব্যবসায় ত্যাগ করেন সেই ঘটনাটি এই—

বরিশালে এক সব্‌জজ ছিলেন, তাঁহার এইরূপ খেয়াল ছিল যে, নিম্নআদালতে যে-সকল নথি তলপ করা হইত না উচ্চ আদালতে দরকার হইলেও তিনি তাহা উপস্থিত করিতে দিতেন না। অশ্বিনীকুমার এই সব্‌জজের আদালতে এক মামলায় তাঁহার মক্কেলের পক্ষে যে বিষয় ধরিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতেছিলেন নিম্নআদালতে তাহার নথি দাখিল করা হয় নাই। বিপক্ষের বৃদ্ধ উকীল তখন বলিলেন, এই যে বিষয়ে যুক্তি দেখান হইতেছে এই বিষয়ে কি নিম্ন আদালতে কোন নথি দাখিল করা হইয়াছিল? অশ্বিনীকুমার যদি সত্য উত্তর দিয়া বলেন, "না" তাহা হইলে তাঁহার মক্কেল মামলায় হারিয়া যায়। তিনি চতুরভাবে হাঁ, না, কিছুই না বলিয়া তাঁহার হস্তস্থিত সমস্ত নথি বিচারকের সম্মুখে ধপাস্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"মহাশয়, এইত

সমস্ত নথি রহিয়াছে, পেশ হইয়াছে কিনা দেখিয়া লউন।” এই মামলায় অশ্বিনীকুমারের মক্কেল জয়লাভ করিল কিন্তু সত্যনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার আপনার অন্তরের অন্তরে এই মিথ্যা-চরণের তীব্র জ্বালা এমন ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে আর আইনের ব্যবসায় করা সম্ভব-পর হইল না।

---

# তৃতীয় অধ্যায়

## শিক্ষক অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমার শিক্ষকরূপেই বিশেষভাবে পূজিত হইতে-ছেন। ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বর্জ্জন করিয়া তিনি শিক্ষাদান করাই তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই শিক্ষাক্ষেত্রেই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি একাধারে ছাত্রদের শিক্ষক, বন্ধু ও পিতা ছিলেন। কেবল সদুপদেশের দ্বারা নহে, নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি ছাত্রদের মনে সদ্‌ভাব জাগরিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। যাহারা শিক্ষার্থিরূপে তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারা জানেন অশ্বিনীকুমারের সঙ্গগুণে শত শত বালক ও যুবকের চরিত্রে পুণ্যপ্রেমের রং ধরিত। বিদ্যার্থীরা তাঁহাকে বিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে, গৃহে সহৃদয় বন্ধুরূপে, রোগীর শয্যাপার্শ্বে সহযোগী সেবকরূপে, ধর্ম্মসভায় আচার্য্যরূপে প্রাপ্ত হইত। বালক ও যুবকদিগের অন্তরনিহিত সদ্‌গুণগুলিকে তিনি নানা দিক হইতে ফুটাইয়া তুলিবার সহায়তা করিতেন। অশ্বিনী কুমারের লোকোত্তর চরিত্রের অসামান্য প্রভাবই বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতার মূল কারণ, ছাত্রগণ যাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ

করিতে পারে অশ্বিনীকুমার সর্ব্বথা সেই চেষ্টা করিতেন বলিয়াই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশদেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন একদিন গিয়াছে যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র মাত্রেই একটু বিশেষত্বের ছাপ প্রাপ্ত হইত। ছাত্রগণ এই বিশেষত্ব কোথায় পাইত? চরিত্রবলসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারই তাহাদের সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বিদ্যমান ছিলেন। ছাত্রগণ দেখিত, অশ্বিনীকুমার এমন আশ্চর্য্য পুরুষ যে, তিনি যাহা উপদেশ দিয়া থাকেন স্বয়ং তাহা আচরণ করেন। অশ্বিনীকুমারের যে সত্যানুরাগ তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের অর্থকরী উপজীবিকা ত্যাগ করাইয়া বিনা বেতনে শিক্ষকের ব্রতগ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাঁহার যে নরসেবাবৃত্তি তাঁহাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বিসূচিকারোগীর সেবায় নিয়োজিত করিত সেই সত্যানুরক্তি ও সেবার দৃষ্টান্ত ছাত্রদের তরুণ চিত্তের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারিত না।

'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখাও'

উপদেষ্টা যাহা বলেন, তিনি তাহা স্বয়ং করেন এমন দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্ল্লভ। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অশ্বিনীকুমারকে এমনি উপদেষ্টারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ই অশ্বিনীকুমারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। ১৮৮৪ অব্দের ২০এ জুন অশ্বিনীকুমার নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন—বর্ত্তমান সময়ে বরিশাল

নগরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের অভাব আছে। এখানকার সরকারী ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, স্থানাভাববশতঃ উক্ত বাটীতে শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে স্কুল গৃহের কুঠরীসংখ্যা আর বৃদ্ধি করা যায় না। ছাত্র বেতন বৃদ্ধির জন্যও প্রস্তাব হইয়াছিল। যদি কেহ ইতোমধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হন সরকার তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই সময়ে একটা বিদ্যালয় স্থাপন নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় আগামী ২৭এ জুন হইতে এই নগরে ইংরাজী এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত শিক্ষার উপযোগী এক স্কুল স্থাপিত হইয়া রীতিমত কার্য্য আরম্ভ হইবে, জুন মাসের বেতন দিতে হইবে না, জুলাই মাস হইতে ছাত্রদিগের বেতন দিতে হইবে। কতিপয় কৃতবিদ্য উপযুক্ত শিক্ষক আসিতেছেন। যে ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় স্কুলে প্রথম হইবে তাহাকে তাহার ইচ্ছামত ৫০৲ পুরস্কার দেওয়া হইবে। বরিশালের সরকারী স্কুলে যেমন পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট আছে এই স্কুলে সেইরূপ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য স্থানীয় কতিপয় উপযুক্ত লোকদ্বারা এক কার্য্যনির্ব্বাহক সভাগঠন করা হইবে।

অশ্বিনীকুমারের ঐকান্তিক ইচ্ছায় সরকারী শিক্ষা সমিতির অনুরোধে অশ্বিনীকুমারের পিতৃদেব নদীয়া ছোট

াদালতের তদানীন্তন জজ মহামতি ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়
ই বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮৮৪ অব্দের ২৭এ জুন ৮৪টি ছাত্র লইয়া বিদ্যালয়ের
ার্য্য আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিনে ছাত্র সংখ্যা ১১৪, তৃতীয় দিনে
৭৯ এবং চতুর্থ দিনে ২৩৪ হয়। সরকারী বৎসর শেষ
ইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩১এ মার্চ্চ ছাত্রসংখ্যা ৩৭৫ হয়; ১৮৮৬
াব্দের ৩১এ মার্চ্চ ছাত্রসংখ্যা ৪৪২ হইয়াছিল। এইরূপে
াত্যল্পকাল মধ্যেই নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বৃহৎ আকার ধারণ
রিল। প্রথমে জেলরোডে ৺হরিঘোষের ভাড়াটিয়া
াকাবাড়ী ও তৎসংলগ্ন টিনের ঘরে স্কুল বসিত।

বরিশালের অন্যতম উকিল বাবু পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়
এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ৺কামিনী
ুমার দত্ত, ৺মন্মথনাথ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন
৺খোসালচন্দ্র রায়, ৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺রসিকলাল
ায়, ও ৺রামচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাকালেই এই
বদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণবাবুর পরে বাবু
বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ
যথাক্রমে ঐ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ অব্দের শেষভাগে
শ্রীযুক্তকালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের
সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ অব্দে তিনি প্রধান
শিক্ষকের পদ লাভ করেন। তিনি পনর বৎসরের অধিক
কাল দক্ষতার সহিত এই পদে কার্য্য করিয়া কলেজের সহকারী

অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। তাঁহার সময়েই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত হয়। কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমারের মনে অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহার তুল্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক অতি বিরল। অশ্বিনীকুমার বলিতেন, "বরিশালে দুই ব্যক্তিকে আমি তাহাদের কর্ত্তব্য নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদনের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, এক জন গোপাল মেথর, অন্যজন কালীপ্রসন্ন।" বস্তুতঃ কালীপ্রসন্ন বাবু কোন কারণে কোন দিন তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে রেখা মাত্র ভ্রষ্ট হন নাই। ব্রজমোহন বিদ্যালয়টিকে তিনি তাঁহার প্রাণের মতন ভালবাসেন। একসময়ে তিনি সরকারী বিদ্যালয়ে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে চাকুরী পাইয়াছিলেন কিন্তু ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মায়া কাটাইয়া তিনি সেই চাকুরী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার স্নেহ প্রীতির দ্বারা সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারেন। আমরা যখন তাঁহার চরণতলে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম তখন কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে এই ছড়াটি প্রচলিত ছিল—

হেড্‌মাষ্টার কালীপ্রসন্ন
রূপ নাই তাঁর, গুণে ধন্য,
পূর্ব্বজন্মে করেছেন পুণ্য,
তাইতে এত গণ্যমান্য।

এক কথায় বলাযায়, কালীপ্রসন্ন বাবু ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে যেমন ভালবাসেন, এত অনুরাগ, এত ভালবাসা কল্পনা করাও

দুরূহ। কালীপ্রসন্ন বাবুর পরে পূতচরিত্র, সুপণ্ডিত, ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার সুশিক্ষা গুণে ও চরিত্রপ্রভাবে শত শত বালক মানসিক ও নৈতিক উন্নতিলাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। অশ্বিনীকুমারের আহ্বানে তাঁহার নূতন শিক্ষান্দোলনে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তদীয় সুযোগ্য ছাত্র ও বন্ধু জগদীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থের লোভে নহে, শিক্ষা-বিস্তার করিয়া যথার্থ মানুষ তৈয়ার করিবার জন্যই ইনি শিক্ষকতাব্রত গ্রহণ করেন। জগদীশের এম্, এ পড়িবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বি,এ পাশের পরে যখন তিনি তাঁহার পরার্থপর বন্ধুর স্বার্থগন্ধশূন্য আহ্বান প্রাপ্ত হইলেন, তখন আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া উক্ত মহৎ কর্ত্তব্য সাধনে বন্ধুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। চিরকুমার জগদীশ অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন মেধাবী পুরুষ। বহুশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। ইনি এক সময়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ইংরাজি সাহিত্য, ইণ্টারমিডিয়েট্ ক্লাসে লজিক ও সংস্কৃত এবং বি এ, শ্রেণীতে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়াইতেন। গীতা, ভাগবত, ষড়দর্শন প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে জগদীশের পাণ্ডিত্য অতি গভীর। উদ্ভিদ্-বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র তিনি আত্মচেষ্টায় এমন সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন যে, অধ্যাপকের সাহায্যেও অনেকে তেমন গভীর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না।

বরিশাল সহরে তিনি কিছুকাল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। এক সময়ে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে গীতাপাঠের জন্য একটি ক্লাস খোলা হইয়াছিল। জগদীশ ছয়বৎসরকাল এই ক্লাসে নিয়মিতরূপে অধ্যাপনা করিতেন। ৬০।৭০ জন ছাত্র তাঁহার নিকট গীতা অধ্যয়ন করিত। স্কুল ও কলেজ স্বতন্ত্র হওয়ার পরে এই ক্লাসটি উঠিয়া যায়। কতিপয় অনুরাগী বন্ধুর অনুরোধে ১৯০৪ কি ১৯০৫ অব্দ হইতে জগদীশ প্রত্যেক রবিবার প্রাতে তাঁহার আশ্রমে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যায় সম্মত হন। প্রথমে এই সভায় শ্রোতৃসংখ্যা অল্প ছিল। কিন্তু এখন শত শত নরনারী এই সচ্চরিত্র ভক্তের মুখনিঃসৃত ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য প্রত্যেক রবিবার তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া থাকেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, মোক্তার, ডেপুটী, মুন্‌সেফ সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই ধর্ম্মসভার নিয়মিত শ্রোতা।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ইহা দেখা যায় যে, বরিশাল নগরবাসীর শিক্ষার অভাব পূরণের জন্য অশ্বিনীকুমারের ঐকান্তিক আগ্রহে ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার ছাত্রদিগকে কিরূপ শিক্ষাদানে অভিলাষী হইয়াছিলেন তাহাই দ্রষ্টব্য। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার দিন নিম্নলিখিত মুদ্রিত উপদেশপত্র পাইয়া থাকে—

এই বিদ্যালয় তোমাকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক

সুশিক্ষা প্রদান করিবে। আমরা বিদ্যালয়ে ও গৃহে উভয় স্থলেই তোমার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিব। তোমার প্রতি আমাদের তত্ত্বাবধান বিদ্যালয় ছুটি হইবার সঙ্গে শেষ হইবে না, তুমি বিদ্যালয়ে অলস হইলে যেরূপ দণ্ড পাইবে, বাড়ীতে দুর্ব্ব্যবহার করিলেও তেমন শাস্তি পাইবে। নিম্নলিখিত উপদেশবাক্যগুলি প্রণিধানপূর্ব্বক প্রতিপালনের চেষ্টা করিও।

(১) তোমার প্রতিদিনের পাঠ, কার্য্য ও খেলার একখানি সময়সূচী প্রস্তুত করিবে এবং সর্ব্বদা সেই সময়সূচী মানিয়া চলিবে।

(২) প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবে। দৈনন্দিন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ মনের বল ভিক্ষা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও।

(৩) কখনও অতিরিক্ত অধ্যয়ন করিও না। অধ্যয়নে নিয়মনিষ্ঠ হইবে, কদাচ উচ্ছৃঙ্খল হইবে না। বৎসরের অধিকাংশ সময় অলসতায় যাপন করিয়া শেষ অংশে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অস্সুস্থ হইও না। যে পাঠ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে তাহা প্রত্যূষে পড়িবার ব্যবস্থা করিবে। আগামী কল্যের পাঠ তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে অদ্য যাহা পড়িয়াছ সেই পাঠ একবার ভাবিয়া দেখিও, শয়ন করিবার পূর্ব্বে সন্ধ্যায় কি পড়িলে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার পরমেশ্বরের নাম করিও।

(৪) তুমি যখন পাঠ কর তখন তোমার মেরুদণ্ড যথাসম্ভব সরল রাখিয়া বসিবে।

(৫) যখন পাঠে নিযুক্ত থাক তখন কাহারও সহিত কথা বলিও না। কাজের সময় কাজ করিবে, খেলার সময় খেলিবে। নিঃশব্দে পড়িলে যদি পাঠে তোমার মনঃসংযোগ না হয় তাহা হইলে উচ্চকণ্ঠে পড়িও। অর্থ না বুঝিয়া কোন বাক্য কদাচ কণ্ঠস্থ করিবার জন্য বারংবার আবৃত্তি করিও না। যদি তুমি মনঃসংযোগ করিয়া ধীরে ধীরে পড় তাহা হইলে দেখিবে যে, এক একটি বাক্য এক কি দুইবার পড়িলেই মুখস্থ হইয়া যাইবে।

(৬) বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্য উপাদেয় উৎকৃষ্ট পুস্তক পড়িবার জন্য বিদ্যালয় ছুটির পরে এক ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিও। ইহাতে তোমার চিত্ত সতেজ ও সরস হইবে। সাবধান, কদাচ কুৎসিত গ্রন্থ পাঠ করিও না।

(৭) অভিধান ব্যবহারে অমনোযোগী হইও না, উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া উহা সুস্পষ্টরূপে পড়িবে। বিশুদ্ধ উচ্চারণ সুসভ্য সমাজে প্রবেশাধিকার পাইবার উত্তম পরিচয়-পত্র।

(৮) অধ্যয়ন সম্বন্ধে তুমি যে সকল বিধি তোমার পক্ষে অনুকূল ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে কর, সেই সকল বিধি কদাচ তোমার সহাধ্যায়ী কিংবা অপর কোন ছাত্রের নিকট

গোপন রাখিও না। যাহারা বিদ্যাচর্চ্চায় তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহাদের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিও, কিন্তু কদাচ কাহার প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করিও না।

(৯) তোমার শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপনাকালে যাহা বলেন সর্ব্বদা তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিও।

(১০) মাতাপিতাকে সম্মান করিও। গুরুজনদের নিকট সর্ব্বদা নম্র থাকিও। বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সমীহ করিও। মনে রাখিও বশ্যতা যৌবনের অলঙ্কার-স্বরূপ।

(১১) কখনও স্পর্দ্ধিতভাবে বিচরণ করিও না, বিনীত ভাব অবলম্বন কর।

(১২) বাক্যালাপে সতর্ক হও। কখনও অশ্লীলবাক্য বলিবে বা লিখিবে না। যেখানে অশ্লীল আলোচনা চলিতে থাকে সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইও।

(১৩) খাওয়া-পরায় সাদাসিদা হইবে।

(১৪) সর্ব্বদা পবিত্র হইও। অপবিত্র অভ্যাস শত শত উন্নতিশীল যুবকের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে।

(১৫) সরল ও সাহসী হও। কদাচ মিথ্যাকথা বলিও না।

(১৬) চরিত্রবান্ বালক ও আদর্শচরিত্র বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গ করিও। অসচ্চরিত্র বালকের সংসর্গ সর্ব্বদা পরিহার করিবে। "তুমি কাহাদের সহিত মেলা মেশা কর বল, আমি তোমার চরিত্র কিরূপ তাহা বলিয়া দিব।" এই প্রবাদ বাক্যটি সকল সময়ে মনে রাখিও।

(১৭) তোমার আমোদপ্রমোদ যেন নির্দ্দোষ হয়। তাস পাশা, দাবা প্রভৃতি কখনও খেলিও না।

(১৮) তুমি যে যে কাজ কর তাহাতে নিয়মনিষ্ঠ ও সময়নিষ্ঠ হইও।

(১৯) যে সকল খেলায় শরীরের সামর্থ্য বাড়ে তুমি সেই সকল খেলা খেলিও। সায়ংকালে এক ঘণ্টা কাল নির্ম্মল বায়ু-প্রবাহিত স্থানে ভ্রমণ করিও। শারীরিক সামর্থ্য যুবক মাত্রের গৌরবের সামগ্রী।

(২০) মনে রাখিও—সাধু যাঁহার সঙ্কল্প পরমেশ্বর তাহার সহায়।

ছাত্রদের শরীর, মন ও আত্মার বিকাশের জন্য যাহা করণীয় সংক্ষেপতঃ তাহা সমস্তই এই উপদেশপত্রে রহিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের রচিত এই উপদেশপত্র পাঠ করিলে ইহা বুঝাযায় যে, ছাত্রদিগকে কোনরূপে পরীক্ষায় পাশ করাইবার জন্য তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই। ছাত্রদের সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব লাভই ছিল তাঁহার কামনা। এইজন্যই তিনি উপদেশ পত্রের প্রারম্ভেই ছাত্রদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন—"তোমাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ দশটা চারিটা নহে—আমরা যেমন বিদ্যালয়ে তেমন বাড়ীতে তোমাদের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিব।" বস্তুতঃ তাহাই তিনি করিতেন।

অদ্ভুতকর্ম্মা অশ্বিনীকুমার কথায় ও কাজে এক ছিলেন। তাঁহাকে রাত্রি আটঘটিকার পরে শত শত দিন লণ্ঠন হাতে

করিয়া ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তাহাদের সংবাদ লইতে দেখিয়াছি। তাঁহার সস্নেহ সম্ভাষণ ও অমায়িকতায় ছাত্রগণ এমন আনন্দ অনুভব করিত যে, ছাত্রাবাসে অনেক ছাত্র উৎসুকভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। তিনি যে, আদর করিয়া জোড়ে জোড়ে পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া দিতেন তাঁহার সেই আদর ও সেই পবিত্র স্পর্শ লাভের জন্য ব্যাকুলতাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের মনে জাগিয়া থাকিত। এমন সময় ছিল যখন অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন কলেজের প্রত্যেকটি ছাত্রকে চিনিতেন। সকলের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। ছাত্রগণ তাহাদের এই শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকের সহিত বন্ধুভাবে মিশিবার সুযোগ পাইত। শত শত ছাত্র তাঁহার আশ্চর্য্য ভালবাসায় মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিত। তিনি আগ্রহের সহিত ছাত্রদের সুখদুঃখ, সবলতাদুর্ব্বলতা, পাপপুণ্যের কথা শুনিতেন। তাহাদের মানসিক দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য তিনি কখন কখন তাহাদিগকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া তাহাদের সহিত অশ্রুপূর্ণ লোচনে পরমেশ্বরের নাম করিতেন। এইরূপ পুণ্য ও প্রেমের দ্বারা তিনি ছাত্রদের যথার্থ হিতসাধনের চেষ্টা করিতেন। এমন প্রেমিক ও পুণ্যাত্মা শিক্ষক দুর্লভ।

অশ্বিনীকুমারের ঘরখানি লোকসমাগমে সমস্ত দিন ও রাত্রির প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হাটের মত মনে হইত। বালবৃদ্ধ-যুবক সকলেই তাঁহার সঙ্গ লোভনীয় বলিয়া মনে করিতেন।

সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিতই তিনি মনের আনন্দে আলাপ করিতেন কিন্তু ছাত্রদের সংসর্গেই তাঁহার আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিত। হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া যাইত। তাঁহার বিদ্যালয়ের জনৈক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক যখন শিক্ষকতা ছাড়িয়া কার্য্যান্তরে গমন করিতে যাইতেছিলেন তখন অশ্বিনীকুমার কাশীধামের রাণামহল হইতে তাঁহাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"তুমি যে কাজে যাইতেছ তাহাতে আমারও সহানুভূতি আছে। তবে যে কাজে ছিলে উহা তাহা অপেক্ষাও গুরুতর। যুবকদিগের চরিত্রগঠন অপেক্ষা মহত্তর কোন কার্য্য আছে আমি তাহা মনে করি না। আর বালকযুবকের সঙ্গে নিজেরই বা কত লাভ! Dr. P. C. Roy যে এমন আছেন তাহা ঐ সঙ্গ গুণে—কিংবা তাঁহারা লোকোত্তর ব্যক্তি তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।" যুবকদিগের চরিত্রগঠনরূপ পবিত্র কার্য্যই অশ্বিনীকুমারের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল, এই ব্রত-সাধনের নিমিত্ত তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং যুবক ও বালকদের সঙ্গেই তাঁহার পুণ্যময় জীবনের অধিকাংশ কাল ব্যয়িত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের মহৎ চরিত্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বহু আত্মত্যাগী সুশিক্ষক সামান্য বেতনে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদেরই আন্তরিক আনুকূল্যে অশ্বিনীকুমারের ব্রজমোহন বিদ্যালয় ভারতবিখ্যাত আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে পারিয়াছিল। পরম ভগবত চিরকুমার জগদীশ,

দরিদ্রবান্ধব কালীশচন্দ্র, অক্লান্তকর্ম্মী অক্ষয়কুমার, ধর্ম্মপ্রাণ মনোমোহন, কর্ম্মযোগী সতীশচন্দ্র, তেজস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ, জ্ঞানযোগী রজনীকান্ত প্রভৃতি সুশিক্ষকগণের নাম ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্তে চিরদিন সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। অর্থের আকর্ষণে নহে, মানুষ তৈয়ার করিবার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া ইহাঁরা "সত্য,প্রেম-পবিত্রতার" পতাকাবাহী-অশ্বিনীকুমারের বিদ্যালয়ের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সেবায় ব্রজমোহন বিদ্যালয় শিক্ষার পুণ্যময় কেন্দ্রে পরিণত হইল। সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ, ছোট বড় রাজকর্ম্মচারিগণ, দেশ-বিদেশের বহুগুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে এই বিদ্যালয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক সুপণ্ডিত কানিংহাম সাহেব ব্রজমোহন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া মোহিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

—"বঙ্গদেশে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মত উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় থাকিতে বাঙ্গালী ছাত্রেরা অক্স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজে বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য কেন যায়, আমি তাহা বুঝিনা।" ১৮৯৭—৯৮ অব্দের সরকারী বার্ষিক শিক্ষাবিবরণীতে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"The school is unrivalled in point of discipline and efficiency. It is an institution that ought to serve as a model to all Schools—Government and Private." অর্থাৎ "ছাত্রদের ব্যবহারের শিষ্টতা ও শিক্ষার উৎকর্ষের

হিসাবে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন বিদ্যালয় নাই। এই বিদ্যালয় সরকারী ও বেসরকারী সকল বিদ্যালয়ের আদর্শ হওয়া উচিত।" ব্রজমোহন বিদ্যালয় দুই একবার নহে, বহুবৎসরই প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৮৯ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় শতকরা ২২জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল, ঐ বৎসর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শতকরা ৮২জন বালক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিল।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় স্কুলটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্ততঃ পাঁচ বৎসরকাল বিদ্যালয়ের কার্য্য না দেখিয়া ইহাকে কলেজে পরিণত করা বিধেয় নহে, এইরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ায় দত্ত মহাশয়ের ইচ্ছা তখন কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ১৮৮৬ অব্দের ৩১এ জানুয়ারী মহামতি দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করেন।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলে উৎসাহিত হইয়া পাঁচ বৎসর পরে অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় পরলোকগত পিতৃদেবের অভিলাষানুসারে ১৮৮৯ অব্দের ১৪ই জুন বিদ্যালয়টিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহোদয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তারপর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষাধিক কাল বিচক্ষণতার সহিত কলেজের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ যেমন সুশিক্ষিত, তেমন তেজস্বী পুরুষ। তিনি অশ্বিনীকুমারের সুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্ম্মী ছিলেন। কোন অত্যাচার তিনি নীরবে সহ্য করিতে পারিতেন না। নদীয়াজিলার কুষ্ঠিয়া মহকুমায় তঁাহার বাড়ী। সেখানে নীলকুঠির অত্যাচারে দরিদ্র লোকসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ একদা গ্রীষ্মাবকাশে যখন দেশে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার এক প্রতিবেশী কলুর স্ত্রীর উপর নীলকুঠির কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করে। তিনি উহার প্রতিবাদ করিয়া হাটের মধ্যে লাঠির প্রহারে আহত হন। নীলকরের ভয়ে স্থানীয় কোন লোক ব্রজেন্দ্রনাথের সাহায্য করিতে সাহসী হইলেন না। অশ্বিনীকুমার এই সংবাদ পাইয়া ব্রজেন্দ্রনাথকে বরিশাল নগরবাসীর প্রদত্ত চাঁদা হইতে সংগৃহীত ৫০০৲ টাকা এবং কলেজ হইতে তিনমাসের বেতন অগ্রিম পাঠাইলেন। বিপন্ন ব্রজেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার কলিকাতায় গমন করেন। তাঁহার সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথ নীলকরদের সহিত মামলায় হাইকোর্টে জয়লাভ করেন। নীলকরেরা বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত এই মর্ম্মে আপোষ করে যে তাহারা আর কদাচ লোকের উপর অত্যাচার করিবে না। নীলকরগণ তাহাদের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল।

অল্পকাল মধ্যে এই অঞ্চলের নীলকুঠি উঠিয়া গিয়াছিল। ব্রজমোহন বিদ্যালয় এমন এক তেজস্বী পুরুষকে কলেজের কর্ণধার প্রাপ্ত হইয়া নিঃসন্দেহ উপকৃত হইয়াছিল। এই সময়েই ব্রজমোহন কলেজের খ্যাতি দেশদেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রের যে কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা আছে ইহা তখন জনসাধারণ স্বীকার করিত। ১৮৯৮ অব্দে বি, এ ক্লাস খুলিয়া অশ্বিনীকুমার তাঁহার এই বিদ্যালয়কে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। বঙ্গের তদানীন্তর ছোট লাট্ স্যর্ জন উড্‌বরণ সরকারী শিক্ষা-বিবরণীতে এই কলেজের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"This Moffusil college promises some day to challenge the supremacy of the Metropolitan (Presidency) college." অর্থাৎ "এইরূপ আশা করা যায় যে, এই কলেজ কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে"।

এই সময়ে বরিশালে 'রাজচন্দ্র কলেজ' নামে অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজ ছিল। বরিশালের মত ক্ষুদ্র নগরে খুব কাছাকাছি দুইটি কলেজ ছিল বলিয়া উভয় কলেজের মধ্যে আড়াআড়ির ভাব অনেক সময় উগ্র হইয়া উঠিত। ইহাতে দুই কলেজকেই অনিষ্ট স্বীকার করিতে হইত। ১৯০৩ অব্দে অশ্বিনীকুমার এই দুই কলেজ সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। অতঃপর রাজচন্দ্র কলেজ উঠিয়া যায়।

## ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা

ব্রজমোহন বিদ্যালয় বঙ্গদেশের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র নগরে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়টি কি কি বিশিষ্টতার জন্য একসময়ে ভাঁরতবিখ্যাত হইয়াছিল এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যা'ক।

শিক্ষার্থীরা যাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে অশ্বিনী-কুমার সেই উদ্দেশ্য মনের সম্মুখে রাখিয়া বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। কিন্তু কেবল সরকারী শিক্ষাসমিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তকগুলি উত্তমরূপে পড়াইলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারেনা। এই অধ্যাপনায় ছাত্রদের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু একমাত্র এই শিক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বলাভ সম্ভবপর হইবে কিরূপে? শিক্ষার্থীরা যাহাতে বাল্যকাল হইতে সুনীতি অভ্যাস ও ধর্ম্মানুরাগ লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে "বান্ধব সমিতি" নামে এক সভা আছে। যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে চরিত্রের বল, জনহিতৈষণা ও ঈশ্বরপ্রীতি বৃদ্ধি হয়; যেরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মালোচনায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলে যোগ দিতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে মনোযোগী না হইলে যুবকগণ নীতিহীন হইয়া পড়ে সেই সমস্তের আলোচনার জন্য ঐ বান্ধবসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শনিবার সন্ধ্যার পরে এই সভার অধিবেশন হয়। শিক্ষকগণের কেহ

কিংবা সমাগত কোন শ্রদ্ধেয় ছাত্রবন্ধু সদ্‌গ্রন্থপাঠ কিংবা সত্নপদেশ প্রদান করেন। ধর্ম্মসঙ্গীতদ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ ও শেষ করা হয়। "সত্য, প্রেম, পবিত্রতা" এই সমিতির মূলমন্ত্র।

'বান্ধব সমিতি'তে সর্ব্বপ্রথমে কিছুদিন কেবল সুনীতি-মূলক উপদেশ প্রদত্ত হইত। কিন্তু ঈশ্বরারাধনা বাদ দিয়া কেবল নীতিমূলক উপদেশ প্রদান করিলে সেই শুষ্ক নীতি শিক্ষার্থীদের মনের উপর যথোচিত কার্য্য করিতে পারিবে না, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে ধর্ম্মপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের অনেক দিন লাগিল না। তখন হইতেই বান্ধবসমিতিতে ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে চমৎকার সুফল ফলিল। ভক্ত অশ্বিনীকুমারের মধুর ঈশ্বরোপাসনা শ্রবণে শত শত যুবক ও বালক অশ্রুমোচন করিত। অনেকের তরুণ চিত্তে ধর্ম্ম-জীবন লাভের শুভ আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইত। ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমার তন্ময় হইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে যখন পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেন, তখন তাঁহার তরুণ শ্রোতৃমণ্ডলীও সেই আরাধনা শুনিয়া অশ্রুসিক্ত হইত। ধর্ম্মপ্রাণ জগদীশ, নিষ্ঠাবান্ রজনীকান্ত, পূতচরিত্র কালীশচন্দ্র ধর্ম্মশীল মনোমোহন প্রভৃতি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও পর্য্যায়-ক্রমে এই সান্ধ্য সভায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন।

এই বান্ধবসমিতি একদিকে যেমন ছাত্রদের মনে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া দিয়া তাহাদের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিত,

অন্য দিকে এই সম্মিলনে শিক্ষক ও ছাত্রদের পরিচয়ের এক সুযোগ ঘটিত। ছাত্রগণ শিক্ষকদের হৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইত। 'বান্ধব সমিতি' ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অত্যুৎকৃষ্ট গৌরবময় প্রতিষ্ঠান।

ঐক্য, মৈত্রী, দয়া, পরোপকার, রোগীর সেবা প্রভৃতি সুনীতি কেবল মুখে মুখে শিক্ষা দান না করিয়া কার্য্যতঃ এই সকল শিখাইবার জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে—Band of Unity, Band of Hope, Band of Mercy, The Little Brothers of the Poor, Debating Club, Sporting Club প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। এইরূপ নানা প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের পরিকল্পনা সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গীয় শিক্ষক অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের মনে উপস্থিত হয়।

বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটি সঙ্গীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তব্য বিবৃত করিয়াছিলেন। আমরা যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন ঐ সঙ্গীতটি বরিশালে পথে, ঘাটে, মাঠে, ছাত্রাবাসে সর্ব্বত্র গীত হইত। ছাত্রগণ যখন দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতে যাইত, নদীগর্ভে নৌকায় ভ্রমণ করিত, কিংবা বনভোজনে যাইত তখন তাহারা মনের আনন্দে গাহিত—

আয় ভাই আয়, মাতি নব বলে,
এই মহাব্রত, সাধিব সকলে ;

অদম্য উৎসাহে, যতন করিলে,
স্বরগ হইবে মরত ধাম ॥
ঘৃণা অভিমানে দিবনা বেদনা,
পশুপক্ষিকীট তাঁহারি রচনা ;
প্রচারি জীবনে দয়ার মহিমা,
অহিংসা মন্ত্র জপি অবিরাম ॥
সত্যের নিশান তুলিয়া গগনে,
পবিত্রতামৃত পূরিয়ে পরাণে,
প্রেমডোরে বাঁধি ভাই ভগ্নীগণে,
চল পূর্ণ হবে যত মনস্কাম ॥
অগ্নিদাহে কেহ সর্ব্বস্ব খোয়ায়,
দাঁড়ায়ে না রবো, পুতুলের প্রায়,
রোগীর শিয়রে, মৃত্যুর শয্যায়,
জাগিব গাইব তাঁহারি নাম ॥
সাহিত্যসাগরে রতন খুঁজিয়ে,
বিশ্বশিল্পী পায়ে শিল্পজ্ঞান লয়ে,
সঙ্গীতের সুধা চৌদিকে ঢালিয়ে,
মানবমহত্ত্বে তুলিব তান ॥
অণু মোরা বটে তবু ক্ষুদ্র নই
শতশত ভাই এক প্রাণ হই
শতশত দাঁড় পড়ে দেখ অই
ছুটেছে তরণী না মানি উজান ।

গুরুজন পদধূলি মাথে নিয়ে
সত্যপ্রেমশুদ্ধি পতাকা উড়ায়ে,
ভাসানু তরণী, ধ্রুব তারা চেয়ে,
ঐ দেখা যায় স্বরগ ধাম ॥

এই সঙ্গীতটির মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের ছোট বড় ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে প্রীতির বন্ধন সংস্থাপিত হয়, প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে আপনাকে এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানভুক্ত বলিয়া গৌরব অনুভব করে 'ঐক্যসংঘের' সভ্যগণ সেইরূপ চেষ্টা করিতেন।

ছাত্রগণ জীবপ্রীতির কথা কেবল পুস্তকে না পড়িয়া যাহাতে বাল্যকাল হইতে কার্য্যতঃ অহিংস হয় 'জীবপ্রীতি-সংঘের' সভ্যগণ এই ভাবের বিকাশ সাধনে প্রচেষ্ট হইতেন। বালকগণ যাহাতে গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রতি অত্যাচার না করে, এই সকল প্রাণীর সহিত যাহাতে তাহাদের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সঙ্ঘের সভ্যগণ উহারই তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজপথে যে সকল পশু আহত বা পীড়িত হইয়া পড়িয়া থাকিত সেই সকল জন্তুর সেবার সুব্যবস্থা করা হইত।

বরিশাল ছোট নগর, সেখানে কোনস্থানে আগুন লাগিলে উহা নিবাইবার জন্য ফায়ার ব্রিগেড বা অগ্নিনির্ব্বাপক দল নাই। এই অভাব পূরণের জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে এইরূপ একদল গঠন করা হইয়াছিল, এই দলের উত্তেজনার মন্ত্র ছিল —

অগ্নিদাহে কেহ সর্ব্বস্ব খোয়ায়
দাঁড়ায়ে না রবো পুতুলের প্রায়।

আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের সময় এই সেবকদলের আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া বরিশালবাসী নরনারী বিস্ময়ে অভিভূত হইত। ঐ সেবকগণের কার্য্যে অক্সফোর্ড মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া, কখন বা আপনারা আহত হইয়া বিপন্ন গৃহীদের জীবন ও দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত।

সাধারণতঃ অধিকাংশ ছাত্রই পঠদ্দশায় সিগারেট কিংবা তাম্রকূট সেবনের কুঅভ্যাস প্রাপ্ত হয়। কোন কোন ছাত্র এই সময়ে পানদোষেও আক্রান্ত হইয়া থাকে। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে এইরূপ কু-অভ্যাসের দাস না হয় বিদ্যালয়ের একদল ছাত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সেইরূপ চেষ্টা করিত। ইহাদের চেষ্টায় বহু ছাত্র ধূমপানের কু-অভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত।

আমরা যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পড়িতাম তখন উক্ত বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রত্যেক শনিবার স্ব-স্ব ক্লাসে সভায় মিলিত হইয়া নানাপ্রকার সদালোচনা করিত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এই সকল সভার সভাপতির কার্য্য করিতেন। কোন একটি নির্দ্ধারিত বিষয়ে ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ রচনা লিখিত, কেহ কেহ মৌখিক বক্তৃতা করিত। সর্ব্বশেষে সভাপতি শিক্ষক মহাশয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে

স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। ছাত্রদের মনে অধ্যয়নস্পৃহা জাগরিত করিয়া দিবার জন্য কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদিগকে কৌতূহলোদ্দীপক উৎকৃষ্টগ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন।

বিদ্যালয়ে এই যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল সেই সমস্তের কার্য্য এবং বিদ্যালয়ের নৈতিক অবস্থা আলোচনার নিমিত্ত একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ছিল। প্রত্যেক শ্রেণী হইতে দুই জন প্রতিনিধি ঐ সভায় প্রেরিত হইতেন। কতিপয় শিক্ষক এবং ছাত্র প্রতিনিধিগণ আবশ্যক মতে মিলিত হইতেন।

## দরিদ্রবান্ধবসমিতি

দরিদ্রবান্ধবসমিতি (The Little Brothers of the Poor) ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ শিক্ষকগণের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে পীড়িত ও আর্ত্তের সেবা করিয়া থাকেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার অসহায় বিসূচিকা-রোগীর দুঃখে বিগলিত-হৃদয় হইয়া এই পুণ্যময় সেবকদল গঠন করেন। বিবেকানন্দ সেবাসদন, বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী প্রভৃতি সেবাসমিতিসমূহের প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে বরিশালে সেবকদল গঠিত হইয়াছিল।

লাখুটিয়া নিবাসী (বর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক) বাবু বরদা প্রসন্ন রায় মহাশয় আসিয়া একদিন দরিদ্রবন্ধু অশ্বিনীকুমারকে এই সংবাদ দিলেন—"ওলাউঠা রোগাক্রান্ত এক মুসলমান

মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছে, তাহার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবার কেহ নাই, এখনই তাহার জন্য কিছু না করিলে এই নিরাশ্রয় ব্যক্তি কয়েক দণ্ডের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অশ্বিনীকুমার তৎক্ষণাৎ এই বিসূচিকারোগীর সেবা করিবার জন্য গমন করিলেন। বরদা বাবু এবং অপর কতিপয় বন্ধুর সহায়তায় তিনি রোগীর চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিলেন। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তখন ক্ষুদ্র বরিশাল নগরটি ওলাউঠা রোগের আবাসভূমি ছিল। তখন লোকে এই রোগকে এমন ভয় করিত যে, রোগীর সেবা তো দূরের কথা, অনেকেই রোগীর কাছে যাইতেও সাহসী হইত না। ফলে নিরাশ্রয় দুঃস্থ ওলাউঠা রোগী বিনা চিকিৎসায়, বিনা পরিচর্য্যায় ভবলীলা সাঙ্গ করিত। অশ্বিনীকুমার এই অসহায় রোগীদের সেবার জন্য 'দরিদ্রবান্ধবসমিতি' স্থাপন করেন। এই সদনুষ্ঠানে ব্রাহ্মভক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, বরিশাল জিলাস্কুলের শিক্ষক বাবু মহিমচন্দ্র রায়, বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু চন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ মথুরানাথ সেন এবং বরদাপ্রসন্ন বাবু তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেই দুর্দ্দিনে এই হৃদয়বান্ সেবকদল বরিশালে কি বিস্ময়কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এখন তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। ১৮৮৯ অব্দে অক্লান্তকর্ম্মী পরলোকগত বাবু অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়

"দরিদ্রবান্ধবসমিতির" পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণ রোগীর সেবারূপ পুণ্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া গাহিত—

"রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায়
জাগিব গাইব তাঁহারি নাম"।

১৮৯০ অব্দের জানুয়ারী মাসে অক্ষয় বাবুর আকস্মিক পরলোকপ্রাপ্তিতে ব্রজমোহন বিদ্যালয় এক অসামান্য একনিষ্ঠ উৎসাহী কর্ম্মী ও হৃদয়বান্ সেবককে হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

অতঃপর পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "দরিদ্র-বান্ধবসমিতির' পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে সম্যক্ পরিপুষ্ট করেন। সেবাধর্ম্ম কালীশ-চন্দ্রের জীবনের ব্রত ছিল। এই মহৎব্রত সাধন করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন এবং তাঁহার পুণ্যচরিত্রের প্রভাবে শত শত যুবক সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এক্ষণে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এই পুণ্যব্রত আচরণ করিতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ কালীশচন্দ্র বরিশাল সহরে বিপন্নের বন্ধু, আর্ত্তের সহায়, দরিদ্রের বান্ধব, ছাত্রদের সুহৃদ বলিয়া সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমার কালীশচন্দ্রকে আপন বিদ্যালয়ে শিক্ষক পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেন। কালীশচন্দ্র প্রায় বিশ বৎসর কাল দরিদ্রবান্ধবসমিতির পরিচালনা করিয়া বরিশালবাসী বালবৃদ্ধযুবক সকলের

মনে পুণ্যময় সেবাধর্ম্মের ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। বরিশাল নগরে লোকের মনে সেবাধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ এমনভাবে উজ্জ্বল হইয়া আছে যে, এখন আর এই নগরে ব্রাহ্মণচণ্ডাল, হিন্দুমুসলমান, স্পৃশ্যঅস্পৃশ্য রোগাক্রান্ত হইয়া কেহ চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার সহযোগীরা যে পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান জন্য সেবকদল গঠন করিয়াছিলেন এখন সেই ব্রত সমগ্র নগরবাসী গ্রহণ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বরিশালের দরিদ্রবান্ধবসমিতির আদর্শে বঙ্গের বহুনগর ও পল্লীগ্রামে সেবকদল গঠিত হইয়াছে।

অক্লান্তকর্ম্মী পুণ্যশ্লোক কালীশচন্দ্রের কর্ম্মভূমি বরিশাল। তাঁহার জন্মভূমিও বরিশাল নগরের অদূরবর্ত্তী রামচন্দ্রপুর নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। তিনি ব্রজমোহন কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুজ। কালীশচন্দ্র দুঃখদারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মচেষ্টায় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়টি দয়ার মধুর রসে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেবকদলের দলপতি হওয়ায় বরিশাল-বাসী তাঁহার হৃদয়মাধুর্য্যের ও বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৩২১ অব্দের ৩১এ শ্রাবণ বরিশালবাসী নরনারী তাহাদের এই ভক্তিভাজন দেবোপম সুহৃদ্‌কে হারাইয়া শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার বিদ্যালয়ের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ পূতচরিত্র কালীশচন্দ্রকে হারাইয়া গভীর মনোবেদনা প্রাপ্ত হইলেন।

পরদুঃখকাতর কালীশচন্দ্র যে দরিদ্রবান্ধবসমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সেই সমিতি শত শত রোগী ও অসহায় ব্যক্তির সেবা করিতেন। সেনাধ্যক্ষের আদেশে রণক্ষেত্রে যেমন সৈন্যগণ অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া থাকে এই সমিতির সেবকগণ সেইরূপ দলপতির আদেশে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া বিসূচিকা-রোগীর সেবা করিতেন। এই সেবকদলের মহত্ত্বব্যঞ্জক সেবাকাহিনীর কোন ধারাবাহিক বিবরণ কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই স্থলে সেবকগণের কার্য্যপ্রণালীর দুইটি মাত্র ঘটনা প্রদত্ত হইল—

একদিন এই সংবাদ আসিল বরিশাল নগর সংলগ্ন এক পল্লীগ্রামে একবাটীতে ১২ জন লোক ভীষণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। প্রতিবেশীরা ভীত হইয়া ইহাদিগকে ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ একদল সেবক ঘটনাস্থলে যাত্রা করিল। আর দুইদল সেবক চিকিৎসক ও ঔষধাদির সংগ্রহার্থ প্রস্থান করিল। প্রথমদল যাইয়া দেখিলেন, ইতোমধ্যে রোগীদের তিনজন প্রাণত্যাগ করিয়াছে, জীবিত ও মৃত রোগীরা ভেদবমি ও নানাপ্রকার অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সেই উচ্চবংশীয় কলেজের যুবকগণ আপনাদের হস্তে

মল, মূত্র ও সমস্ত অপবিত্র জিনিষ পরিষ্কার করিয়া চিকিৎসক মহাশয়ের আগমনের পূর্ব্বেই ঘরটিকে যথাসম্ভব রোগীদের বাসোপযোগী করিয়া ফেলিলেন। এই সেবকগণের মহত্ত্বপূর্ণ সেবাগুণে ৬টি রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

"বরিশাল নগরে রাজপথের পার্শ্বে একদিন সেবকগণ এক বাতব্যাধিগ্রস্তা বৃদ্ধাকে কুড়াইয়া পাইল। চারিজন বলিষ্ঠ যুবক একখানি খাটালিতে করিয়া বৃদ্ধাকে সুবিধাজনক এক-স্থানে লইয়া গেলেন। দশবারজন সেবক সেই স্থানটি পরিষ্কার করিয়া সেখানে বাঁশখড় প্রভৃতিদ্বারা নিজেদের হস্তে একটি ছোট ঘর তৈয়ার করিলেন। চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধা সেখানে বাস করিত। এই বৃদ্ধার সর্ব্বপ্রকার সেবা সেবকগণ পালাক্রমে করিতেন। বৃদ্ধার ঘর পরিষ্কার করা, তার খাবার জিনিষ বাজার হইতে আনা, খাদ্যপানীয় দেওয়া, ঘরে সন্ধ্যাবাতি দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজ সেবকগণ করিতেন।" ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবাপরায়ণ ছাত্রদের সেবায় মোহিত হইয়া এক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী বলিয়াছেন—"বিদেশে মরিলে যেন এই বরিশাল সহরেই আমার মৃত্যু হয়।"

পুণ্যশ্লোক কালীশচন্দ্র উল্লিখিতরূপ নিঃস্বার্থ সেবাব্রতে বরিশালনিবাসী যুবকদিগকে দীক্ষিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সেবার ভাবটি সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য বরিশালবাসী জনমণ্ডলী

*কালীশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে "কালীশচন্দ্র আতুরাশ্রম"* স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত আশ্রমে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অল্পসংখ্যক রোগীকে আশ্রয় প্রদান করিয়া চিকিৎসা ও সেবা করা হইতেছে।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের এই সেবাসমিতির সংশ্রবে বরিশালবাসী চিকিৎসক মহাশয়দের সহৃদয়তার কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত, ডাক্তার ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার বিহারীলাল বিশ্বাস এবং অপর চিকিৎসকগণ আহূত হইবামাত্র বিনাদর্শনীতে প্রসন্নমনে নিরাশ্রয় রোগীদিগকে চিকিৎসা করিতেন। এক্ষণেও অনেক চিকিৎসক এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া সেবক ও রোগীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। বরিশালবাসী অসহায় রোগীদের অকৃত্রিম বন্ধু জনপ্রিয় সুচিকিৎসক তারিণী কুমার গুপ্ত মহাশয় অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর অল্পকাল পরে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। দরিদ্রবান্ধবসমিতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমার মনে আছে, মুমূর্ষু রোগীর জন্য রাত্রি দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রহরেও তাঁহাকে আহ্বান করা হইলে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। বসন্তরোগ ভীষণ সংক্রামক বলিয়া সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের যুবকদিগকে এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সেবায় নিযুক্ত করা হয় না। একবার সেবকদলের এক দলপতি দুইটি ছাত্রসহ এক বসন্ত রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

ঘটনাক্রমে রোগীর ভবনেই তারিণীকুমারের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল, তিনি দলপতিকে সস্নেহ তিরস্কারে উক্ত রোগীর নিকট হইতে ছাত্রদ্বয়সহ প্রস্থান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার ত্যাগী পুরুষ, ত্যাগের উচ্চ আদর্শ লইয়া তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মশক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন। ছাত্রদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষাদিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ে যে সকল আয়োজন করিয়াছিলেন সংক্ষেপে আমরা সেই সমস্ত আলোচনা করিয়াছি। অশ্বিনীকুমারের আদর্শে অনুপ্রাণিত বহু সুযোগ্য শিক্ষক ও অধ্যাপক এখনও নিষ্ঠাসহকারে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবা করিতেছেন। যাঁহারা ত্যাগের ও সেবার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবা করিতে করিতে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অক্লান্ত কর্ম্মী অক্ষয়কুমার, দয়ার অবতার কালীশচন্দ্র এবং মনস্বী ছাত্রবন্ধু অধ্যাপক শশিমোহন বসাক মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রজমোহন বিদ্যালয় বিদ্যাবিক্রয়ের সাধারণ পণ্যশালা নহে। অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য অশ্বিনী-কুমার এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই। দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় দেশবাসীকে অল্প ব্যয়ে সুশিক্ষা দানের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার

স্কুলকলেজ হইতে কদাচ এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। কেবল তাহা নহে সাধারণ মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারী হইয়াও তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য অকাতর চিত্তে ৩৫ হাজার টাকা দান এবং স্বয়ং প্রায় ১৭।১৮ বৎসর বিনা বেতনে অধ্যাপকতা করিয়াছেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, অশ্বিনীকুমার তাঁহার আইন ব্যবসায়ের জমানো পসার অবহেলায় ত্যাগ করিয়া ঘরের খাইয়া বিনা বেতনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন বহু বুদ্ধিমান্ লোক নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলিয়াছিলেন—"লোক্‌টা পাগল"। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জাতীয় মহাসমিতির মান্দ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"অশ্বিনীকুমার ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় করিলে স্বনামধন্য স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সমকক্ষ হইতে পারিতেন।" এত বড় সম্ভাবনা, অর্থোপার্জ্জনের এমন সুবর্ণসুযোগ যিনি ত্যাগ করেন বুদ্ধিমানেরা তাহাকে "পাগল" বলিবেন বই কি ? সব ছাড়িয়া অশ্বিনীকুমার কি হইলেন ? হইলেন "বিদ্যালয়ের শিক্ষক"। বস্তুতঃ শিক্ষকতাকে তিনি অতি পবিত্র, অতি উচ্চকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। ছাত্রগণ কি প্রকারে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল লাভ করিয়া যথার্থ মানুষ হইতে পারিবে ইহাই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান ছিল। ইহারই ফলে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শত শত যুবক যথার্থ সুশিক্ষা প্রাপ্ত

হইতে পারিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের অনুরাগী শিষ্যদের অনেকেই তাঁহাদের গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন। এখনও বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগে নানা স্থলের স্কুল ও কলেজে যাঁহারা চরিত্রবান্ সুশিক্ষক বলিয়া ছাত্রদের শ্রদ্ধাপ্রীতি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রসংখ্যা অল্প নহে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্গদেশে এমন একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না যেখানে শিক্ষকদের মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র দেখা না যাইত। ধর্ম্মপরায়ণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাঁহারা সুশিক্ষা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহাদের চরিত্রে কিছু না কিছু বিশেষত্ব দেখা যাইত। তিনি ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহার পাঠনা এমন হৃদয়গ্রাহী হইত যে ছাত্রেরা নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিত। ইংরাজী সাহিত্যে অশ্বিনীকুমারের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার সুমিষ্ট বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং অধ্যাপনার মনোহর ভঙ্গী ছাত্রদের হৃদয় রঞ্জন করিত। অতি উত্তম অভিনয় দর্শনে যেমন আনন্দ জন্মে সাহিত্যরসিক অশ্বিনীকুমারের নিকট "ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ" টেনিসন্' সেলি' প্রভৃতি কবিগণের কবিতা পাঠ করিয়া সেইরূপ আনন্দ পাওয়া যাইত। অধ্যাপক হিসাবে অশ্বিনীকুমারের স্থান কোথায় হইতে পারে তাহা অসংশয়ে বলিতে পারি না। তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর

কীর্ত্তিশালী অধ্যাপক বঙ্গদেশে অনেক ছিলেন ও রহিয়াছেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

অশ্বিনীকুমারের অন্যতম প্রিয় শিষ্য কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল বাবু গুণদাচরণ সেন মহাশয় রামমোহন লাইব্রেরীর স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন—"ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে তখন যে দুইটি টিনের ঘর ছিল তাহার একটি ঘরের নির্জ্জন কক্ষে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল। সেই অবধি প্রত্যেক দিন স্কুল কলেজের ছুটির পর বাড়ী আসিয়া খাইয়াই মোহাবিষ্টের মত তাঁহার গৃহে সেই তক্ত পোষখানার উপর তাঁহার পিঠের কাছে গিয়া বসিতাম। তিনি হয়ত কিছু পড়িতেন, না হয় কোন সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, আর আমরা ছেলের দল অভিভূত হইয়া শুনিতাম। তিনি কখন কখন আমাদিগকে লইয়া পায়ে হাঁটিয়া বা নৌকায় সহরের বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন। নুন লঙ্কার সহিত চাল্‌তা মাখিয়া খাওয়া তখনকার তাঁহার সখ ছিল। মুড়ি প্রায়ই সঙ্গে থাকিত বা সংগ্রহ করিয়া লইতাম। সেই বন জঙ্গলে আমাদের মত তিনিও ছুটাছুটি করিতেন। রাত্রিতে কোন কোন দিন তাঁহার কাছেই থাকিতাম।

"শিশু ভাবিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, তিনি ভালবাসিয়া প্রাণের কথা আদায় করিয়া লইতেন, অথচ কোন অসঙ্গত কাজ করিলে তাঁহার ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপিত। যখন যে অপরাধ করিয়াছি চোখের জলে ধুইয়া মুছিয়া আবার

কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। এমন কোনও দুষ্কার্য্য কেহ কখনও করিতে পারে নাই যাহাদ্বারা তাঁহার ভালবাসা হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। প্রেমে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বয়স, জাতি, পদ, সাধু, পাপী নির্ব্বিশেষে তিনি সকলকে এই প্রেমমধু বর্ষণ করিয়াছেন। বাল্যের প্রিয়তম বন্ধু প্রিয়নাথ, ভুবনেশ্বর, ও ত্রিগুণাচরণ সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কণ্ঠ আড়ষ্ট হইয়া আসিত। পঁচিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি বরিশালে ওকালতি করিতে আসিলেন তখন ওলাউঠা ও বসন্ত রোগীর শুশ্রূষায়, আর তারপর ওকালতি ছাড়িয়া বরিশালের যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে তিনি অপরিমেয় প্রেমের লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকেই ভাবিতাম, তিনি আমাকেই বেশী ভালবাসেন, অপরকে আদর করিতে দেখিলে আমার মনে তো অনেক সময় হিংসা হইত।"

"ছেলেদের দমিতে দেখিলে বলিতেন, "তোরা যে সিংহ-শাবক, শেয়াল কুকুরের বাচ্চার মত কেউ মেউ করিস্ কেন?" তেজের বিকাশ দেখিলে প্রফুল্ল হইতেন, বলিতেন—"গর্হিত কিছু করিলেও ভীরুর মত করিও না। বীরের মত নির্ভীক ভাবে কর। যাই কর পুরুষ হও।"

অশ্বিনীকুমারের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ধর্ম্মপ্রাণ দেশসেবক শ্রীযুত ললিতমোহন দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—"গ্রামে যখন মাইনর স্কুলে পড়িতাম তখনই অশ্বিনীকুমারের সুনাম

শুনিতে পাই। অল্পবয়স্ক যুবা, চশ্‌মা চক্ষে, খুব বিদ্বান্, এম, এ পাশ। তৎকালে বরিশাল জিলায় এম, এ পাশ লোক বড় ছিল না। শুনিয়াছিলাম, তাঁহার স্বভাব খুব মিষ্ট, তিনি চরিত্রবান্, ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী। ১৮৮৪ অব্দে যখন মাইনর পাশ করিয়া বরিশালে পড়িতে আসিলাম তখন অশ্বিনীকুমার উকীল। মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। দূর হইতে লোকে দেখাইয়া দিত, ঐ অশ্বিনী বাবু। ঐ বৎসর ২৭এ জুন ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি সেই দিনই গভর্ণমেণ্ট স্কুল ত্যাগ করিয়া ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। শিক্ষকগণ খুব আদরযত্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণ শিক্ষকদের ও অশ্বিনী বাবুর বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁহাদের প্রভাবে আমাদের জীবনের আদর্শ উন্নত হইতে লাগিল। এই বৎসরই আসামের কুলীরমণী স্কুরমণি ও ওয়েব সাহেবের মামলা লইয়া দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। বরিশালে অশ্বিনীকুমার, কালীমোহন, মনোরঞ্জন প্রভৃতি স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। আমরা সেই সকল বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতাম। তখন হইতেই দেশকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছা, জাতীয় জীবনগঠনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রাণে জাগরিত হয়। তখনও অশ্বিনী বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলনা। আমার সমপাঠী অনেকে তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল। আমার ইচ্ছা করিয়া আলাপ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার স্কুলে উৎকৃষ্ট ছাত্র হইলে তিনি

নিজেই আদর করিবেন। ক্রমে তাঁহার সাথে আলাপ হইল। তিনি আদর করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার চরণতলে বসিয়া সকল বিষয় শিক্ষালাভ করিতে লাগিলাম। তিনি তখনও ওকালতী করিতেন। এইসময়ে তিনি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিতেন, আমরা সেই সকল মুখস্থ করিতাম। ক্রমে তাঁহার বাসায় যাওয়া আরম্ভ করিলাম। তিনি আদর করিতেন, তাঁহার এই আদরের প্রণালী ছিল স্বতন্ত্র। কিল, চড়, লাথি মারিয়া তিনি আদর দেখাইতেন, ইহা আমাদের খুব ভাল লাগিত। তিনি তখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সেখানে বক্তৃতা করিতেন, নিয়মিত মত উপাসনাতে যাইতেন। আমি ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম না। আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন পূজার পরে বরিশালে আসিয়া দেখি বাসাতে রান্নার বন্দোবস্ত নাই। অশ্বিনীবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইলাম। তখন তিনি প্রত্যেক রবিবার প্রাতঃকালে ছাত্রসমাজে বক্তৃতা করিতেন। 'জলের মধ্যে আগুন' 'সরকারে খাব' এইরূপ সব অদ্ভুত বিষয়ে বক্তৃতা হইত। বক্তৃতা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইত, গোপনে যাইতাম, কারণ বাবা কিংবা অন্য কোন অভিভাবক জানিতে পারিলে রাগ করিবেন। একদিন যাইয়া দেখি, বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। মন্দির লোকে পূর্ণ; আমি কোন রকমে পশ্চাতের বেঞ্চে স্থান করিয়া লইলাম। অশ্বিনীবাবু এক একটী কথা কহিতেছেন, আর থামিতেছেন, হঠাৎ তিনি পড়িয়া

গেলেন। আর "কবে সহজে মা বলে জুড়াব প্রাণ" এই গান আরম্ভ হইল। বক্তৃতা আর হইল না। ১০টা পর্য্যন্ত গান চলিল। কি উদ্দীপনা. কি বিভোর ভাব। অশ্বিনী বাবু সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতেন। সেই দিন প্রথম হইতেই ঐভাব হইয়াছিল। আমার দুঃখ হইল, আগে কেন আসিলাম না, তদবধি সকালে উপাসনার পূর্ব্বে মন্দিরে যাইতাম। সে সময়ে বরিশালে যেন নূতনভাবের নবদ্বীপের আবির্ভাব হইল। জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে প্রত্যহ কীর্ত্তন হইত। অশ্বিনীকুমার, কালী-মোহন, মনোরঞ্জন, মনোমোহন, গোরাচাঁদ, গোবিন্দচন্দ্র, দ্বারকানাথ, মথুরানাথ প্রভৃতি বহুলোক সমবেত হইয়া গভীর রজনী পর্য্যন্ত কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিতেন।

এদিকে অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসের কার্য্যেও উৎসাহী ছিলেন। ছাত্রগণের মধ্যে নীতি, ধর্ম্ম ও স্বদেশপ্রীতির ভাব জাগরিত করিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে বরিশালে ফ্লোটিলা কোম্পানী ও কারঠাকুর কোম্পানীর ষ্টীমারের প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। লোকে যাহাতে ঠাকুর কোম্পানীর ষ্টীমারে খুলনা যায় আমরা সেই চেষ্টা করিতাম। 'স্বদেশী' নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইল। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ কাগজ বিক্রয় করিতাম। আমাদের স্কুলের ছাত্রগণ যাহাতে নীতিপরায়ণ, স্বদেশভক্ত ও ধর্ম্মশীল হয় তজ্জন্য অশ্বিনীবাবু ও শিক্ষকগণের বিশেষ যত্ন ছিল।

তখন ব্রজমোহন স্কুলের সুনাম পড়িয়া গিয়াছিল। ১৮৮৮ অব্দে আমরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেই। সেইবারে বৃত্তিতে গভর্ণমেণ্ট স্কুলকে হারাইয়া আমরা গৌরব অনুভব করিয়া

অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার

ছিলাম। অশ্বিনীবাবু, বরদাপ্রসন্ন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ রোগীর সেবা, দুঃখীর দুঃখ-দূরীকরণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নিরাশ্রয় রোগীর খবর পাইলেই ইহারা সেবা করিতে যাইতেন। আমরাও পালাক্রমে সেবা করিতে যাইতাম। বরিশাল সহর যেন আমাদের হইয়া গেল। আমরা জল-

পানির খরচ কমাইয়া ঐ টাকা গরীবদুঃখীকে দান করিতাম।”

শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন এবং ললিতমোহন দাস মহাশয়-দ্বয়ের সাক্ষ্য হইতে আমরা ইহা অসংশয়ে বুঝিতে পারি যে, বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় এবং তাঁহার বিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষক গণ ছাত্রদের চরিত্রগঠনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এমন এক সময় ছিল যখন বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এক বাক্যে ইহা স্বীকার করিতেন যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেমন কর্ত্তব্য-পরায়ণ, যেমন কর্ম্মকুশল, অপর সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তেমন নহে। অনেক রাজকর্ম্মচারী তখন আগ্রহে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের তদানীন্তন ছাত্রদের নীতিপরায়ণতার একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, তখন বাৎসরিক কিংবা বাছনি পরীক্ষার সময় পরীক্ষাগৃহে পাহারা দিবার দরকার হইত না। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে বিশ্বাস করিতেন, ছাত্রগণও সেই বিশ্বস্ততা রক্ষা করিত। একে অন্যের কাগজ দেখিয়া কিছু লিখিয়াছে এমন অভিযোগ তখন শুনা যাইত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার পরিদর্শনে যাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, এক প্রশস্ত হলে শত শত ছাত্র পরীক্ষার উত্তর লিখিতেছে,

কোন অধ্যাপক সেখানে নাই কিন্তু এক জনেও অপরের লিখিত উত্তর দেখিতেছেনা। ইহাতে তিনি বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া বিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে পরলোকগত এক যুবকের বুদ্ধিমত্তা ও সরলতার কথা মনে পড়িতেছে। ছাত্রটির নাম শিশির, তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হরকান্ত সেন মহাশয় বরিশালে স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। এই ছাত্রটি যখন কোন বার্ষিক কিংবা বাছনি পরীক্ষা দিতেছিলেন তখন একদিন সকাল বেলায় তাঁহার হাতে বিকাল বেলাকার একখানি প্রশ্নপত্র পড়িল। তিনি ঐ প্রশ্নপত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বিনীকুমারের কাছে উপস্থিত হইয়া বিষয়টি জানাইলেন। অশ্বিনীকুমার বালকটির সুবিবেচনায় এবং সততায় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা হলে গমন করিয়া তদন্ত করিয়া জানিলেন যে, অপর সকল ছাত্রই ঠিক প্রশ্নপত্র পাইয়াছে। তখন বিকাল বেলায় ঐ বালকটিকে নূতন এক প্রশ্নপত্র দেওয়া হইল। বালকটির সততায় পরীক্ষায় কোন প্রকার বিভ্রাট ঘটিতে পারে নাই। এই ঘটনাটি ক্ষুদ্র কিন্তু এইরূপ সততা তুর্লভ কিনা পাঠকগণ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার ছাত্রদের মনে এইরূপ নীতিজ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দিতে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার নেতৃত্বাধীনে ব্রজমোহন বিদ্যালয় সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধাস্থল হইতে পারিয়াছিল।

## রাজকর্ম্মচারীদের রোষ

একাদিক্রমে বিশবৎসরকাল ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বিঘ্নে চলিল। এই বিদ্যালয়ের সুনাম দেশময় ব্যাপ্ত হইল। ছোট, বড় সরকারী ও বেসরকারী সর্ব্বশ্রেণীর লোক এক বাক্যে বলিতেন—"এমন বিদ্যালয় আর নাই। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যেমন সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় আর কোথায় তেমন পায় না।" স্যর বীট্সন বেল যখন সেটেল্মেণ্ট বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন তখন তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি অশ্বিনীকুমারকে তাঁহার বিদ্যালয়ের এই সকল ছাত্রের কর্ম্মদক্ষতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া বহু পত্র লিখিয়াছেন। সরকারী ও বেসরকারী শত শত বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া ইহার শিক্ষা প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বঙ্গবিভাগের পরে অকস্মাৎ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের মতি পরিবর্ত্তিত হইল। এত দিন তাহাদের চক্ষে যে বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী, শিক্ষা ও শিষ্টতা অতীব প্রশংসনীয় ছিল, এক্ষণে উহার সমস্তই বিরূপ হইয়া গেল। লাট ফুলার সাহেবের অধীন সরকারী কর্ম্মচারীরা এই সময়ে মনে করিতেন, ব্রজমোহন বিদ্যালয় রাজনীতি আন্দোলনের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইতে তখন এই বিদ্যালয়টিকে নির্য্যাতিত করিবার কোন চেষ্টার ত্রুটী হইল না।

তখন অশ্বিনীকুমারের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আর সরকারী চাকুরী পাইতেন না। "সত্য, প্রেম, পবিত্রতা" ছিল যে বিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র সেই বিদ্যালয়ের অহিতাচরণে গভর্ণমেণ্ট তখন বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, গভর্ণমেণ্ট সহসা ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের উপর ক্ষেপিয়া উঠিলেন কেন? ইহার কারণ এই যে, এই সময়ে অশ্বিনীকুমার কেবল বরিশাল সহরের ছাত্রদলের হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেন তাহা নহে, তিনি সমগ্র বরিশাল জিলাবাসী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর হৃদয়সিংহাসনের রাজা ছিলেন; তাঁহার আদেশে সমস্ত জিলার লোক উঠিত বসিত। কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকগণ দেশসেবায় তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। এই কার্য্যে স্বদেশবান্ধবসমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। ব্রজমোহন বিদ্যালয় রাজনীতি চর্চ্চার ক্ষেত্র ছিল না, কিন্তু এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার সহযোগীদের প্রভাব নিপতিত হইত এবং ছাত্রগণও তাহাদের শক্তি অনুসারে দেশচর্চ্চায় নিয়োজিত হইত তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমুদ্র যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তখন জলপ্রবাহে স্বতঃই নদীখালবিল পূর্ণ হইয়া থাকে, স্বদেশী আন্দোলন ঠিক সেইরূপ ছিল। এই আন্দোলনে দেশের বালবৃদ্ধ নরনারী সাময়িকভাবে সকলেই মাতিয়াছিল। ব্রজমোহন

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তখন বিলাতি দ্রব্য বিক্রয়ে বাধাপ্রদান এবং স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের বিশেষ চেষ্টা করে নাই, এমন কথা বলিয়া সত্যের অপলাপ করিব না। ছাত্রদের সেই আচরণ হয়ত সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীদের নিকট অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু ঐ আচরণ যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও মনুষ্যোচিত ছিল তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। বিদ্বেষবুদ্ধিশূন্য ধর্ম্মপ্রাণ অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার সহকারীদের দেশসেবা যতই নির্দ্দোষ হউক, বরিশালের ছাত্র ও জনমণ্ডলীর উপর তাঁহার যে অপ্রতিহত প্রভাব ছিল উহাই রাজকর্ম্মচারীদের রোষের কারণ হইল। এই রোষের বশবর্ত্তী হইয়াই গভর্ণমেণ্ট ১৯০৮ অব্দে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সরকারীবৃত্তি প্রাপ্তির অধিকার কাড়িয়া লন। এই বিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র শ্রীযুত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রবেশিকা ও ইণ্টার মিডিয়েট্ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াও বৃত্তিপ্রাপ্ত হন নাই।

ছোট লাট্ স্যর জন উডবরণ, ও ছোট লাট স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ এবং বিভাগীয় ডাইরেক্টর মহোদয়গণ মুক্ত কণ্ঠে যে বিদ্যালয়ের শিষ্টতা, শিক্ষাপ্রণালী ও উচ্চ নীতিশিক্ষার প্রশংসা করিয়াছিলেন লাট ফুলার সাহেব সহসা সেই বিদ্যালয়ের উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হইলেন না। সরকারী চাকুরী ও সরকারী বৃত্তি প্রাপ্তির

সম্ভাবনা না থাকিলেও ব্রজমোহন বিদ্যালয়কক্ষ ছাত্রশূন্য হইলনা। বানরীপাড়া স্কুলের মেধাবী ছাত্র শ্রীযুত মধুসূদন সরকার প্রবেশিকাপরীক্ষার বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া ব্রজমোহন কলেজেই ভর্ত্তি হইলেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রদানের অধিকার প্রাপ্ত না হয় গভর্ণমেণ্টের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মর্ম্মে পত্র ব্যবহারও চলিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন পুরুষসিংহ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি সরকারের অভিযোগ তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রথমে ডাক্তার পি, কে, রায় এবং দ্বিতীয়বারে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্ ও অধ্যাপক কানিংহাম সাহেবকে ব্রজমোহন বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ পাঠাইয়াছিলেন। এই পরিদর্শনের ফল অতি সন্তোষজনক হইল। অধ্যক্ষ জেমস্ ও কানিংহাম সাহেব ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কোন প্রকার নিন্দাতো করিলেনই না, বরং অজস্র প্রশংসা করিলেন। যে বিদ্যালয়টিকে সকলেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, যে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্র-দিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষাদান্ করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত, স্যর আশুতোষ বিনাদোষে সরকারের অন্যায় অনুরোধে সেই বিদ্যালয়টির মঞ্জুরী ( Affiliation ) কাড়িয়া লইতে পারিলেন না।

রুষ্ট রাজকর্ম্মচারীরা ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিনাশসাধনে

কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু যখন সরকারের আদেশে বিনা বিচারে ১৮১৮ অব্দের ৩ আইনে বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার সুযোগ্য সহকর্ম্মী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইলেন তখন এই বিদ্যালয়টি কাণ্ডারীবিহীন তরণীর ন্যায় তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে আন্দোলিত হইতেছিল। যিনি হিমগিরির মত অটলভাবে দাঁড়াইয়া প্রতিকুল ঝটিকার প্রচণ্ডতার প্রতিরোধ করিতেন সেই পুরুষ-সিংহ অশ্বিনীকুমার যখন কারারুদ্ধ হইলেন তখনই প্রকৃতপক্ষে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। কলেজ টিকিবে কিনা ছাত্র ও অধ্যাপকদের মনে এই দুর্ভাবনার উদয় হইল। ছাত্রদের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহারা কেহ কেহ বলিতে লাগিল, কলেজ উঠিয়া যাইবে এখন আমাদের অন্য কলেজে যাইয়া ভর্ত্তি হওয়া আবশ্যক।

এই সময়ে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন নির্ভীক জ্ঞানবীর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয়। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ছাত্রদিগকে জানাইয়া দিলেন—"তোমরা চঞ্চল হইও না, স্থিরচিত্তে পড়াশুনা কর, ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে কিছুতেই উঠিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বাঁকিপুরে রামমোহন রায় একাডেমি স্থাপন করিবার জন্য আমি প্রথম যৌবনে মাসিক দশ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতাম, দরকার হইলে এই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে আবার দশ টাকা বেতনে কার্য্য করিব।" তেজস্বী অধ্যক্ষ মহাশয়ের মুখে এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া

ছাত্রদের চিত্ত চাঞ্চল্য তিরোহিত হইল। তাঁহার তেজস্বিতায় সেই দুর্দ্দিনে ব্রজমোহন বিদ্যালয় রক্ষা পাইল।

### ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থা

ইতোমধ্যে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ গভর্ণমেণ্টকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন যে, ছাত্রগণ রাজনীতি আন্দোলনে যোগ দিবে না, তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট ছাত্রদিগকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার আদেশ প্রত্যাহার করেন। এদিকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হইল। সেই বিধি অনুসারে কলেজ রক্ষা করা বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য হইল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারিগণ সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইয়াও উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য জমি ক্রয়, বাটী নির্ম্মাণ,

ব্রজমোহন স্কুল

গ্রন্থালয়ের জন্য পুস্তক ক্রয় প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। আরও প্রচুর অর্থ ব্যয়

করিয়া তাঁহারা প্রথমশ্রেণী কলেজটির সত্তা রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা তাঁহাদের মনে এই সংশয় উপস্থিত হইল। তাঁহারা ইহাও প্রকাশ করিলেন যে, বি,এ ক্লাশ তুলিয়া দিয়া তাঁহারা কলেজটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবেন।

তখন বরিশাল বি, এম কলেজের দেশব্যাপী খ্যাতি। কলেজে বহু বৎসর যাবৎ বি,এ ক্লাসে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেছে। বি,এ ক্লাস উঠিয়া গেলে বহু দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দূর হইবে বলিয়া কলেজের বহু হিতৈষী বন্ধু কলেজটিকে পূর্ণাঙ্গরূপে রক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সরকারী সাহায্য ব্যতীত কলেজটিকে সুচারুরূপে পরিচালনা করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইল।

বরিশালবাসীর সৌভাগ্যক্রমে এই সময় তথাকার অক্সফোর্ড মিশনের সুযোগ্য অধিনায়ক শিক্ষানুরাগী রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত ই,এল, ষ্ট্রং মহোদয় এই কলেজের উচ্চ আদর্শ ও গুণগ্রামের কথা স্মরণ করিয়া সরকার ও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে গোলযোগ মীমাংসা করিয়া দিতে সম্মত হন। ১৯১২ অব্দের মার্চ্চ মাসে কলেজের স্বত্বাধিকারিগণ লেখাপড়া করিয়া এই কলেজের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া উহার পরিচালনার ভার এক সমিতির হস্তে অর্পণ করেন। বিদ্যালয়ের স্কুল বিভাগ পূর্ব্ববৎ স্বত্বাধিকারীদের হস্তে রহিল।

বর্ত্তমানে কাশীপুর রোডের পার্শ্বে ৪৩৷৷০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া নূতন কলেজবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। কলেজের

আয়তন বৃদ্ধির আবশ্যকতা বিবেচিত হইলে নিকটবর্ত্তী জমিও ক্রয় করিতে পারা যাইবে। ব্রজমোহন কলেজ এখন বঙ্গের

ব্রজমোহন কলেজ

অন্যতম বৃহৎ কলেজে পরিণত হইয়াছে। প্রায় দেড় সহস্র ছাত্র এখানে শিক্ষা পাইতেছে কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমারের অন্তরে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, কলেজের এই পরিণতিতে তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হইয়াছে বলিতে পারি না। যেরূপ স্বাধীনতার পরিবেষ্টনের মধ্যে তিনি দেশের যুবকদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে চাহিতেন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে সেই উদ্দেশ্য সম্যক্ সংসিদ্ধ হইতে পারে ইহা তিনি মনে করিতে পারিতেন না। দারিদ্র্যের পীড়নে এবং হয়তো লোকমতের তাড়নায় কলেজ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের জীবদ্দশায় ব্রজমোহন স্কুল জাতীয়

বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। যখন তিনি ভগ্নদেহ, একরূপ বলিতে গেলে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, সেই সময়ে তাঁহার বিদ্যালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয় করিবার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বরিশালবাসী জনসাধারণের অভিপ্রায়ে ঐ বিদ্যালয়টিকে আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়াধীন করা হইয়াছে।

বরিশালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল রায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর একবার দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অশ্বিনীকুমারের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছিলেন—"কেমন হে অশ্বিনী বরিশালের ছাত্রমহলে কি আগুন জ্বালায় নাই? সে যে একটা আগুনের হল্‌কা"। শিক্ষক অশ্বিনীকুমার যে এক সময়ে বরিশালে শত শত বালক ও যুবকের হৃদয়ে "সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার" আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ নাই। ভক্ত কেশবের মত অশ্বিনীকুমার অগ্নিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ঋত্বিক বরিশালে যে হোমাগ্নি জ্বালিয়াছিলেন তাহা কি একেবারে নিবিয়া গিয়াছে?

---

# চতুর্থ অধ্যায়

## দেশ-সেবক অশ্বিনীকুমার

### বরিশালে কর্ম্মক্ষেত্র

যে সকল দেশ-হিতৈষী মনস্বী ব্যক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের অনেকের সহিত অশ্বিনীকুমারের দেশ-সেবার এই একটি বিশিষ্ট প্রভেদ ছিল যে, প্রেমিক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার যাহাদের নিকট দেশের কথা বলিতেন তাহাদের সহিত তাঁহার হৃদয়গত একটা যোগ ছিল। তিনি জনসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে এবং কার্য্যে এক হইয়া যাইতে পারিতেন। লোকে অশ্বিনীকুমারকে 'আপন জন' বলিয়া জানিত। ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, ব্রাহ্মণ ও নমঃশূদ্র, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই অবাধে তাঁহার কাছে আসিয়া সকল প্রার্থনা জানাইত। তিনি সকলের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিতেন, এমন সাধ্য তাঁহার ছিল না, থাকাও অসম্ভব। যাহা পারিতেন তাহা করিতেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ মিষ্ট বাক্য, সহানুভূতি ও মধুর ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইতেন।

অশ্বিনীকুমার বরিশালকে ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া বরিশালের সেবা করিয়া বরিশালকে নিজের

মনের মতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই বরিশালবাসী তাঁহার প্রেমে বাঁধা পড়িয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের শুভাকাঙ্ক্ষা লইয়া অশ্বিনীকুমার বরিশাল সহরে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে রোগশয্যায় একদিন বলিয়াছিলেন—"আমার এই দেহ আর উঠিবে না, বাঁচিলেও এই জীর্ণদেহ দ্বারা কোন কায হইবে না। তাই ঠাকুরকে বলি, এটাকে শীগ্‌গির লইয়া গিয়া একটা নূতন দেহ দাও। আবার নূতন শক্তি, নূতন তেজ লইয়া কাযে লাগি। বরিশালেই আবার আসিব।" এমনই প্রেম ছিল তাঁহার বরিশালের উপর।

মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে বরিশালের সরকারী উকীল মহাশয়ের নিকট তিনি তাঁহার বরিশাল-প্রীতি নিম্নলিখিত-রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"নির্ব্বাণ চাই না, মোক্ষ কামনা করি না, আবার এই পৃথিবীতে আসিতে চাই, আবার খাটিতে চাই।" "কোন্ দেশে?" "এই ভারতবর্ষে।" "কোন্ প্রদেশে?" "সোণার বাঙ্গলায়।" "কোন্ জিলায়?" "তাও কি বলিতে হইবে? বরিশালে।" "কিন্তু একটা কথা বলিতে পারিতেছি না, কাহার ঘরে জন্মিব। বাপ হইবার উপযুক্ত লোকত আর দেখিতে পাইতেছি না। একজন ছিল আপনি তাহাকে ফাঁসি দিয়াছেন।" "কে সে?" "আব্‌দুল।"

আব্‌তুল ভীষণ দস্যু, নির্ম্মম নরহন্তা কিন্তু চিত্ত তার এমন ভয়শূন্য ছিল যে, সে ফাঁসির আগের রাত্রিতেও নিরুদ্বেগে ঘুমাইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার এমন এক তেজস্বী নির্ভীক পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া আবার তাঁহার নূতন জন্মের নব শক্তিদ্বারা বরিশালের সেবা করিতে চাহিয়াছেন। বরিশালের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল এমনই গভীর, এমনই আন্তরিক।

যে প্রীতিদ্বারা অশ্বিনীকুমার বরিশাল জিলার সেবা করিয়াছেন এবং জন্মজন্মান্তরেও বরিশালের সেবা করিবার আন্তরিক কামনা জানাইয়া গিয়াছেন তাঁহার সেই প্রীতি বরিশাল জিলাবাসী সাধারণ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হইত। বরিশালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল রায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাতুর লিখিয়াছেন—আমার সাক্ষাতে একদিন নমঃশূদ্রজাতীয় কোন ব্যক্তি কয়েকজন ভদ্র লোককে বলিয়াছিল—"বরিশালটা আমার বেশ লাগে, বিশেষতঃ ঐ নদার পাড়টা আর বাবুকে। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবু কে?' সে বলিল, "বাবু আর কে, অশ্বিনীবাবু"। প্রশ্নকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"কেন রে, অশ্বিনীবাবু ছাড়া কি বরিশালে আর লোক নাই?" সেই লোকটি বলিল—"আছেত কিন্তু" সে আর তাহার বাক্য শেষ করিল না। এই নমঃশূদ্র সাধারণ লোকটিও যে অশ্বিনীকুমারের উদার হৃদয়ের পবিত্র প্রীতির অমোঘ পরিচয় পাইয়াছিল তাহার উক্তি হইতে উহা বেশ বুঝা যাইতে পারে।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার উদারতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারদ্বারা কি প্রকারে বরিশাল জিলার ছোট বড় সকলের মনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন মনস্বী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা উহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী কোন ব্যক্তি নমঃশূদ্রদিগকে ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য একজন নিষ্ঠাবান্ স্বদেশ-সেবক নমঃশূদ্রকে বলিয়াছিলেন—"বাবুরা ত বন্দেমাতরং বলিয়া ভাই ভাই এক ঠাঁই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুকা চলে না, তবু তোমরা তাদের ভাই, কথাটীত মন্দ নয়!" এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তির মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া যায়। সেই সময়ে অশ্বিনীবাবু ঐ অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য ঐ নমঃশূদ্র অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে বসিয়াছিলেন। শয্যার নিকটেই এক ফরাশ পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটী অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতি নমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাহাকে ডাকিয়া পরিচয় লইয়া তাহার

সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তারপর অশ্বিনীকুমার তাহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটী বলিলেন —'বাবু, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশ্যক, আমার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা কহিতেছেন তখনই বুঝিয়াছি 'বন্দেমাতরং' সত্য এবং আমরা আপনাদের ভাই।

অশ্বিনীকুমার এমনই সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মেলামেশা করিতে পারিতেন। মহাত্মা গান্ধীজী ব্যতীত অপর কোন জন-নায়ক ভদ্রইতর নির্ব্বিশেষে এই প্রকার সকলের সহিত মেলামেশা করিতে পারেন এমন কথা শুনা যায় না। এই অনন্যসুলভ লোক-প্রীতি, অসামান্য সত্যানুরাগ এবং চরিত্রবলই অশ্বিনীকুমারকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল। তাঁহার প্রিয়-শিষ্য উকীল শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন মহাশয় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—১৮৮০ অব্দ হইতে ১৯১০ অব্দ পর্য্যন্ত ত্রিশ বছরের বরিশালের ইতিহাস যদি কোন চিন্তাশীল লেখক ভাল করিয়া লিখিতে পারেন তাহা হইলে দেখিব যে অশ্বিনী-কুমারের প্রেম ও আনন্দ, সংযম ও তিতিক্ষা, আশা ও উদ্যম ন্যূনাধিক পরিমাণে বাকরগঞ্জের সকল গৃহেই প্রবেশ করিয়াছিল। বাগ্মিতায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, চিত্ত-রঞ্জনী

শক্তি তাঁহার অদ্ভুত ছিল, তথাপি অতি ক্ষুদ্র বরিশাল সহরটি ছাড়িয়া কলিকাতার টাউন হলে কিংবা স্কোয়ারে একটিও বক্তৃতা করিতে আমরা জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রাজি করিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া যশের দোকান খুলিলে দু'পয়সা রোজগার হইত, তাহাও করিলেন না। কৃপণের ন্যায় তাঁহার সমস্ত পুঁজিপাটা তিনি বরিশালের মাটিতেই পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় "চরিত কথায়" লিখিয়াছেন—"অশ্বিনীকুমার কখনও সাধারণ ইংরাজীনবিশদিগের মত জীবন কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া কর্ম্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সখের দায়ে আপনার দেশ ছাড়িয়া আসেন নাই। বরিশালেই তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে আরম্ভ করেন। আমাদের দশজনের মতন তিনি যদি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার আধুনিক কর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আজ যেস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন সে স্থান কিছুতেই পাইতেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।"

## কর্ম্মক্ষেত্রের অবস্থা

অশ্বিনীকুমার যখন তাঁহার বুকভরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া বরিশালবাসীর সেবা করিবার জন্য বরিশাল সহরে উপস্থিত হইলেন তখন বরিশালের কি অবস্থা ছিল? ডাক্তার

সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় তৎপ্রণীত পুস্তিকায় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"সেখানে ধনের স্থান ছিল বিদ্যার উপরে, ধন ব্যয়িত হইত ধান্যেশ্বরীর সেবায়, বিদ্বানেরা মাথা বিকাইতেন বিদ্যাধরীদের চরণতলে।" তখন ভদ্রইতর কেহই মদ্যপান করিয়া পতিতানারীগৃহে নিশাযাপন দূষণীয় মনে করিতেন না। বরিশালের রাজপথদিয়া অসঙ্কোচে পতিতা নারীরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিত। সমগ্র সহরে আগন্তুক ভদ্রলোকদের থাকিবার মত একটি হোটেল পর্য্যন্ত ছিল না। যাহারা কার্য্যোপলক্ষে বরিশালে আসিতেন, তাহারা বেশ্যালয়ে ঘরভাড়া নিয়া থাকিতেন। ইহার ফলে অনেক সচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রলুব্ধ হইয়া চরিত্রহীন হইত।

বরিশালের এই শোচনীয় নৈতিক দুর্গতিদর্শনে অশ্বিনীকুমার ব্যথিত হইলেন। তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগকে এই দুর্নীতির পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন তাঁহার চেষ্টায় অল্পদিন মধ্যেই বরিশালের নৈতিক আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইল। পতিতা-নারীদের দলবদ্ধ অবাধ ভ্রমণ বন্ধ হইল। তাহারা অশ্বিনীকুমারকে দূরে লক্ষ্য করিবামাত্র কুলবধূদের মত ঘোম্‌টা টানিয়া দূরে চলিয়া যাইত। অশ্বিনীকুমার রঙ্গ করিয়া বলিতেন—"আমি এদের ভাসুর ঠাকুর (স্বামীর অগ্রজ)"। নগরে মদ্যপানের প্রচলন হ্রাস হইল। অশ্বিনীকুমারের আন্দোলন আরম্ভের পরে যুবাবৃদ্ধ কেহই প্রকাশ্যে মাত্‌লামি

করিয়া বাহাদুরী বোধ করিত না। মদ্যপান যে নিন্দনীয় এই বোধ ভদ্রইতর সকলেরই বুদ্ধিগম্য হইল।

বরিশালে সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় কোন কোন ব্যক্তি অশ্বিনী-কুমারের পুণ্যস্পর্শে আসিয়া মদ্যপানের অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারের কীর্ত্তন ও শাস্ত্রপাঠ সভায় কীর্ত্তনের আনন্দে মাতিয়া বলিয়াছিলেন—"অশ্বিনীরে, তুই আমায় এ কি করলি, বোতলের পর বোতল মদে কোন দিন আমায় টলাতে পারেনি, আর তোর কথা আজ আমায় এমনভাবে মাতাইতেছে?" অশ্বিনী কুমারের প্রচেষ্টায় শত শত ব্যক্তি মদ্যপানের কুঅভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল।

১৮৯৩ অব্দে এংগ্লোইণ্ডিয়ান মাদকতা নিবারণী সমিতির মুখপত্র 'আবকারী' কাগজে পরলোকগত কেন্ সাহেব (Mr W. S. Caine) অশ্বিনীকুমারের ছবি মুদ্রিত করিয়া লিখিয়াছিলেন—"এই যে ভারতীয় ভদ্র লোকের চিত্র এখানে মুদ্রিত হইয়াছে, ইনি আমাদের মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনে প্রথম হইতেই যোগদান করিয়াছেন এবং এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সকল সংখ্যায় ইহার প্রেরিত তথ্যপূর্ণ সংবাদ ও পত্রাদি মুদ্রিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বরিশাল সহরে আইনের ব্যবসায় করেন এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র।" মদ্যপান নিবারণের এই আন্দোলন

অশ্বিনীকুমার বরিশাল জিলায় করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অশ্বিনীকুমারের প্রচেষ্টায় বরিশাল জিলার ৫২টা বিলাতী মদের দোকানের ৫০টাই উঠিয়া গিয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে আসিয়া আইনের ব্যবসায় আরম্ভ করেন তখন বরিশালের উকীলদের মধ্যে এই একটি কুপ্রথা ছিল যে, উকীলেরা যখন কাছারীতে আসিতেন তখন ভৃত্যেরা তাহাদের মাথায় ছত্র ধারণ করিত। এই অনাবশ্যক নবাবীয়ানা অশ্বিনীকুমার সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি বাক্যতঃ ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বয়ং নিজের ছাতা নিজে বহন করিয়া কাছারীতে আসিতেন। প্রবীণেরা বলাবলি করিতেন—"এ বালক করে কি?"

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে গমন করেন তখন বরিশালে রাজনীতির কোন আলোচনা ছিল না। তখনকার উকীল সমাজমধ্যে স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয়ই সর্ব্বপেক্ষা তেজস্বী ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন। বরিশালে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বি, এল উপাধিধারী উকীল। তখনকার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্তে যেমন স্বাধীনতাসম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইহার মনেও তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল। অশ্বিনীকুমারের বরিশাল সহরে গমনের পূর্ব্বে লোকসাধারণের পক্ষ হইতে ইনিই কখন কখন সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন।

দেশেরকথা ভাবিবার, দেশেরকাজ করিবার জন্য কোন প্রকার প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না।

## বরিশাল জনসাধারণসভা

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিতেন, অশ্বিনীকুমার একটা আগুনের হল্‌কা। বস্তুতঃ অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে আগুনের মাত্রা প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি যে স্থানে থাকিতেন, সে স্থান তাঁহার নিজের তেজে গরম করিয়া তুলিতে পারিতেন। "যেখানে থাক্‌বি সেখান গরম করে তুল্‌বি" এই উপদেশ তিনি শতশত যুবককে দিতেন, তাঁহার শিষ্যেরা ঐ উপদেশ কে কতদূর পালন করিতে পারিয়াছেন তাহা জানিনা। কিন্তু উপদেষ্টা যে স্বয়ং বরিশাল সহর গরম করিয়া তুলিয়াছিলেন ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অশ্বিনীকুমারের শক্তির পরিচয় পাইতে প্যারিলাল রায় মহাশয়ের অনেক দিন লাগিল না। অশ্বিনীকুমারকে পাইয়া তাঁহার দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় বাবু রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু হরনাথ ঘোষ, ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, উগ্রকণ্ঠ রায়, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো-পাধ্যায়, অভয়ানন্দ দাস, ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত, হরকান্ত সেন, বিহারীলাল রায় প্রভৃতি স্বাধীনপ্রকৃতি উৎসাহী যুবক

দিগকে লইয়া "বরিশাল জনসাধারণ সভা" স্থাপন করেন। এই সভাই বরিশালের সর্ব্বপ্রথম দেশহিতৈষী প্রতিষ্ঠান। এই সভা দ্বারাই সেই যুগে স্বাধীনতার হাওয়া অতি মৃদুভাবে বহিতেছিল। স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয় ইহার সভাপতি এবং স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার সম্পাদক বৃত হন। রাখাল বাবুর পরে অশ্বিনীকুমার এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পদ লাভ করেন। এই সভার প্রচেষ্টায়ই বরিশাল সহরে জনমতের সৃষ্টি হয়। গভর্ণমেণ্টও এই রাষ্ট্রনৈতিক সভাটিকে মানিতেন। সেকালে বঙ্গের ছোটলাটগণ পরিদর্শনকালে এই সভায় অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইতেন। অশ্বিনীকুমার এই রাষ্ট্রীয় সভার পক্ষ হইতে দেশের বাণী প্রচারের জন্য সমগ্র জিলার গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় স্থানে স্থানে শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সকল সমিতি কিঞ্চিৎ চাঁদা এবং সমিতির কার্য্যবিবরণী বরিশাল জনসাধারণ সভায় পাঠাইতেন। এই শাখাসমিতি গুলিদ্বারা এক সময়ে গ্রামের (১) জনসংখ্যা (২) পাঠশালা (৩) ছাত্রসংখ্যা (৪) জলাশয়ের অবস্থা (৫) রাস্তাঘাটের অবস্থা (৬) স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইত।

১৮৮৬ অব্দ হইতে "বরিশাল জনসাধারণ সভা', জাতীয় মহাসমিতির প্রদর্শিত পথে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। বরিশাল হইতে প্রত্যেক বৎসর জাতীয় মহাসভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরিত হইতেন। এক বিরাট্ জনসভায়

এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতেন। এই প্রতিনিধির পাথেয় নগরবাসীদের নিকট হইতে এক এক টাকা চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করা হইত। এই সুযোগে লোকসাধারণকে জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া হইত। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করিয়া প্রতিনিধি যখন ফিরিয়া আসিতেন তখন ষ্টীমারঘাটে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া অভিনন্দিত করা হইত। অতঃপর এক জনসভায় প্রত্যাগত প্রতিনিধি জনমণ্ডলীকে জাতীয় মহাসমিতির কার্য্য বিবরণী শুনাইতেন। অশ্বিনীকুমার বহুবার বরিশালবাসী জনমণ্ডলীর প্রতিনিধি হইয়া জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন।

স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৯০৫ অব্দ) এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্যারিলালের ধী-শক্তির প্রতি অশ্বিনীকুমারের এমন আস্থা ছিল যে, তাঁহার অভিমত না লইয়া তিনি কদাচ কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যাঁহারা শ্রদ্ধাভাজন, অশ্বিনীকুমার সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে প্রচুর শ্রদ্ধার্পণ করিতে পারিতেন বলিয়াই তিনি যাঁহাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তাহারা তাঁহাকে নরদেবতাজ্ঞানে ভক্তিঅর্ঘ্য প্রদান করিতেন।

## ভারত গীতি

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশাল সহরে কিংবা মফঃস্বলে গ্রামে

গ্রামে বক্তৃতা করিতেন, তখন বক্তৃতার পূর্ব্বে একটি জাতীয় সঙ্গীত গান করা হইত। কিন্তু অশ্বিনীকুমার যখন দেশ সেবায় ব্রতী হন তখন বঙ্গদেশে জাতীয় সঙ্গীতের একান্ত অভাব ছিল। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত একখানি মাত্র পুস্তিকায় অল্প কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত ছিল। এই অভাব দূর করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার সময়োপযোগী কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া 'ভারত গীতি' নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। বরিশালের 'সত্যপ্রকাশ' যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পুস্তিকা খানি স্বর্গীয় কালীমোহন চক্রবর্ত্তি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের উপরে অশ্বিনীকুমারের নাম ছিল না। লিখিত ছিল "ভারত ভৃত্য কর্ত্তৃক" রচিত।

অশ্বিনীকুমার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, এই জন্য তাঁহার রচিত গানগুলিতে সুর দিয়া দিতেন ভাতশালা গ্রামনিবাসী সুগায়ক নন্দকুমার ঘোষ মহাশয়। সভাস্থলে ঐ গানগুলি সুযোগ ও সুবিধামতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শশধর চক্রবর্ত্তী, কালীমোহন চক্রবর্ত্তী কিংবা বরদাপ্রসন্ন রায় মহাশয় গান করিতেন।

## সংবাদপত্র

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশাল সহরে গমন করেন তখন বরিশাল সহরে "কাশীপুর নিবাসী" ব্যতীত অপর কোন

সংবাদ পত্র ছিল না। তখন লোকে সংবাদপত্রের অভাবও বোধ করিত বলিয়া মনে হয় না। কেবল অল্পসংখ্যক দেশ-হিতৈষী যুবক হয়ত সময়ে সময়ে ইহার কিঞ্চিৎ অভাব বোধ করিতেন। কাশীপুরনিবাসী পত্রিকা রায় সাহেব প্রতাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত। এই কাগজ জনমত প্রকাশের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত না। 'স্বদেশী' ও 'সহযোগী' নামক দুইখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৯৫ অব্দে বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেড্ পণ্ডিত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় "বরিশাল-হিতৈষী" পত্রিকা প্রচার করেন। এই কাগজখানিও সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যাবলীর যথোচিত সমালোচনা করিতে পারিতেন না। এক সময়ে অশ্বিনীকুমার এই সংবাদ পত্রখানিকে স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে পরিচালনার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা নানা কারণে সফল হয় নাই।

ইহার পরে অশ্বিনীকুমার স্বর্গীয় প্যারিলাল রায়, শ্রীযুক্ত হর নাথ ঘোষ, বারিষ্টার শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (রায় বাহাদুর) প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত পরামর্শক্রমে 'বিকাশ' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা কিছুকাল অন্যের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইত বলিয়া যথাসময়ে প্রকাশিত হইত না। এই অভাব দূর করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার

তাঁহার কোন কোন বন্ধুর সাহায্যে স্বয়ং বহুঅর্থ ব্যয় করিয়া একটি বৃহৎ ডবল ডিমাই যন্ত্র ও ছাপার সমস্ত সাজ সরঞ্জাম খরিদ করিয়াছিলেন। তিন বৎসর কাল "বিকাশ" শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহের সম্পাদকতায় নিয়মিত বাহির হইত। তখন মফঃস্বলে কোথায়ও এমন সুপরিচালিত সুবৃহৎ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ছিল না। দুঃখের বিষয় নানা কারণে এই পত্রিকার প্রচার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উক্ত মুদ্রাযন্ত্রে অতঃপর 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকা মুদ্রিত হইত। অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার বন্ধুগণ বিনা মূল্যেই উহা প্রদান করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, বরিশাল হিতৈষী তখন কিছুকাল অশ্বিনীকুমারের মতানুবর্ত্তন করিয়া চলিত। বরিশাল হিতৈষীর বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গামোহন সেন তখন হইতেই এই সংবাদ পত্রখানি সম্পাদন করিতেছেন।

## বরিশালে স্বায়ত্তশাসন

যে সময়ে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের অল্পসংখ্যক দেশহিতকামী ব্যক্তি লার্ট্ রিপন-প্রবর্ত্তিত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনদ্বারা স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই সময়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে আসিয়া আপনাকে দেশ সেবায় উৎসর্গ করেন। অশ্বিনীকুমার তখন নবীন যুবক, উৎসাহ, উদ্যম, আশা ও কর্ম্মানুরাগে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল।

তিনি তখন সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন যে, বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনদ্বারা ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিতে পারিবেন। ১৯১৩ অব্দেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমরা পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যমধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভই আমাদের লক্ষ্য। কোন শক্তি আমাদিগকে এই লক্ষ্য লাভের পথে বাধা দিতে পারিবে না। আমাদের উচ্চাভিলাষ ব্রিটিশ-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণা পত্ররূপ সুদৃঢ় শৈলের উপরে অধিষ্ঠিত। প্রজানুরাগী সম্রাটেরা উক্ত ঘোষণাপত্রের যাথার্থ্য সুদৃঢ় কণ্ঠে বারংবার ব্যক্ত করিয়াছেন।"

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের পন্থা ধরিয়াই যুবক অশ্বিনীকুমার তাঁহার জন্মভূমি বরিশাল জিলার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন বরিশালে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন তখন ১৮৮৫ অব্দে বরিশাল মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। অশ্বিনীকুমারের শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ ও বরিশালবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয় চেয়ারম্যান এবং প্রসিদ্ধ উকীল দীনবন্ধু সেন মহাশয় ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে বাটাজোড়ের রায় দ্বারকানাথ দত্ত বাহাদুর চেয়ারম্যান এবং অশ্বিনীকুমার ভাইস্ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ইহার পর পুনর্ব্বার রায় দ্বারকানাথ দত্ত বাহাদুর চেয়ারম্যান

এবং স্বনামখ্যাত ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত মহাশয় ভাইস্ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে অশ্বিনীকুমার চেয়ারম্যান এবং তারিণীকুমার গুপ্ত মহাশয় ভাইস্ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এইরূপে অশ্বিনীকুমার বরিশাল মিউনিসি-প্যালিটীর সভ্য, ভাইস্ চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানরূপে বহু বৎসর পর্য্যন্ত ইহার সেবা করিয়া বরিশাল নগরের যথার্থ হিত-সাধনে সতত চেষ্টাশীল ছিলেন।

সমগ্র বরিশাল জিলায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন অধিকার প্রদানের বিপক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট্ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় গভর্ণমেণ্ট সমীপে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য বরিশাল জিলাবাসীদের পক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার, উকীল মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ্, লাখুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায় এবং বারিষ্টার মিঃ প্যারিলাল রায় মহাশয় ছোট লাট্ বাহাদুরের নিকট প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে ১৮৮৭ অব্দে বরিশাল সদরে এবং পিরোজপুর মহকুমায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। তখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটেরাই চেয়ারম্যান হইতেন। বরিশাল জিলাবোর্ডে স্বর্গীয় উকাল রজনীকান্ত দাস মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। সদর লোকাল বোর্ডে অশ্বিনীকুমারই প্রথমবারে চেয়ারম্যান বৃত হইয়াছিলেন। এই স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত যুক্ত হইয়া

অশ্বিনীকুমার যাহাদের সহিত কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ উকীল প্যারিলাল রায়, স্বর্গীয় উকীল দীনবন্ধু সেন, উকীল বাবু হরনাথ ঘোষ, পরলোকগত ডাক্তার তারিণী কুমার গুপ্ত, স্বর্গীয় উকীল বাবু রজনীকান্ত দাস, স্বর্গগত রায় দ্বারকানাথ দত্ত বাহাদুর, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে বরিশাল জিলার পথকর বৃদ্ধির আন্দোলন উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৫ অব্দে মিঃ বার্টন সাহেব যখন বরিশালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন তখন রাজস্বের প্রতি টাকায় দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করা হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৭৬ অব্দে বরিশাল জিলায় ভীষণ প্লাবনে প্রায় তিন লক্ষ লোক ও অসংখ্য গবাদি গৃহপালিত পশুর জীবন নাশ হয়। ঐ প্লাবনে লোকের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। প্রজামণ্ডলীর ক্লেশ কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিবার জন্য তখন পথকরের হার অর্দ্ধেক করা হয়। ১৮৯২ অব্দে গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় মতে স্থানীয় বোর্ডের অধিকাংশ সভ্য, পুনর্ব্বার পথকর বৃদ্ধির পক্ষপাতী হইলেন। বলা বাহুল্য দরিদ্র জনমণ্ডলী এই বৃদ্ধির বিরোধী ছিল। জনসাধারণের পক্ষ হইয়া অশ্বিনীকুমার, বাবু প্যারিলাল রায়, বাবু দীনবন্ধু সেন, বাবু হরনাথ ঘোষ, বাবু উগ্রকণ্ঠ রায়, ব্রাউন সাহেব ও ডিসেলবা সাহেব পথকর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল সহৃদয় দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিদের

প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৮৯২ অব্দে পথকর দেড়গুণ এবং ১৮৯৮ অব্দে দ্বিগুণ করা হইল।

## কংগ্রেস ও অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমার যে দিন তাঁহার পরমপ্রিয় জন্মভূমি বরিশালে আসিয়া দেশমাতৃকার পূজার ভার গ্রহণ করিলেন সেই দিন হইতেই তিনি ভক্ত পূজারীর মত প্রত্যহ শ্রদ্ধাভক্তির পবিত্র পুষ্পে জননীর পূজা করিয়াছেন। স্বদেশের হিতসাধন ছিল তাঁহার লক্ষ্য, এই জন্য দেশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও শিক্ষা সকল দিক্ দিয়া যাহাতে বরিশাল উন্নত হয় উহার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। রায় নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "রাষ্ট্রনায়কেরা অনেকেই বঙ্গের পল্লীগুলির কথা না ভাবিয়া একেবারে সমগ্র ভারতের কথা ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু অশ্বিনীকুমার কখনও বরিশালকে উপেক্ষা করিয়া ভারত-সেবক নামে পরিচিত হইবার বাসনা বা চেষ্টা করিতেন না। কোন অনুষ্ঠানেই যে বরিশাল অন্য জিলার পশ্চাতে থাকে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকট কোন পল্লী বাটাজোড়ের ন্যায় প্রিয় ছিলনা, কোন জিলা বরিশাল অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল না, সুতরাং তিনি বরিশালের এবং বরিশালও তাঁহার ছিল।

বরিশালের বাহিরে অন্যত্র নাম জাহির করিবার জন্য কোন ব্যগ্রতা তাঁহার ছিল না। যদিও তিনি আজীবন একজন কংগ্রেসওয়ালা ছিলেন, কিন্তু বরিশালের উন্নতিই তাঁহার—'মন্তব্য, স্মর্ত্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য' ছিল। এই খানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।"

জাতীয় মহাসমিতির নেতৃবর্গ এখন পল্লী সংগঠনের অভিলাষী হইয়াছেন। এইজন্য স্থানে স্থানে চেষ্টাও চলিতেছে। অশ্বিনীকুমার বহুপূর্ব্বে জাতীয় মহাসমিতির এক অধিবেশনে দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা বলিয়াছিলেন—"বছরে তিন দিন কংগ্রেস করিয়া বা সেই উপলক্ষে কয়েক দিন স্থানে স্থানে সভা করিলে দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে না। ইহা তামাসা মাত্র। বছর ভরিয়া প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে সমগ্র ভারতে সমাজের স্তরে স্তরে তিল তিল করিয়া এই কাজটি করিতে হইবে। এই জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন নিতান্ত আবশ্যক।"

কংগ্রেস-সিংহ স্যর ফেরোজ সাহ মেটা অশ্বিনীকুমারের ঐ উক্তিতে উষ্মা প্রকাশ করিয়া "বাবু, বসো" "বাবু, বসো" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার উক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় বক্তব্য বলিতেছিলেন। তখন মেটা মহাশয় তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। যাহা হউক, অশ্বিনীকুমারের ঐ বক্তৃতায় কোন ফল হইল না। কংগ্রেসের প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই যুবক বক্তার বাক্য প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করিলেন না।

অশ্বিনীকুমার বলিতেন, কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক যে সকল প্রস্তাব আলোচনা করেন, গ্রামে গ্রামে সেই সমস্তের আলোচনা না হইলে জনমতের সৃষ্টি হইতে পারে না। এই জন্য কংগ্রেসে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়া গৃহীত হয় উহাকে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দাবী বলা যায়, কিন্তু ভারতীয় জনমণ্ডলীর দাবী বলা যাইতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রামে গ্রামে উপযুক্ত লোক প্রেরণ করা আবশ্যক।

অশ্বিনীকুমার মহাসমিতির সভ্যদিগকে তাঁহার বাক্যানুযায়ী কোন কার্য্য করাইতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি আপনার কর্ম্মক্ষেত্র বরিশাল জিলায় স্বয়ং এইভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নিরক্ষর কৃষকদের দুয়ারে দুয়ারে কংগ্রেসের বার্ত্তা প্রচার করিতেন। রায় নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত বাহাদুর এইরূপ এক সভার বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"আমি যখন স্কুল ছাড়িয়া কলেজে প্রবেশ করিয়াছি তখন অশ্বিনীবাবু রাজনীতির আসরে নামিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সভাসমিতি করিতেছিলেন। একবার পূজার ছুটীর সময়ে তিনি মাহিলাড়া ও বাটাজোড়ের মধ্যবর্ত্তী একস্থানে খোলা মাঠের মধ্যে এক জন-সভা করিয়াছিলেন। সেই সভায়ই আমি তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ ও বক্তৃতা শ্রবণ করি। ঢাকঢোল বাজাইয়া যেমন মেলা বসানো হয়,— সেই প্রণালীতেই তিনি সভায় লোক সমবেত করিতেন।

প্রথমে তাঁহারই রচিত "ভারত-সঙ্গীত" হইতে স্বদেশ-হিতৈষণা-উদ্দীপক একটি গান হইত, তৎপরে তিনি বক্তৃতা করিতেন।"

আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং শিক্ষিত সমাজের অনেকের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ দেশের কথা বুঝিতে পারিবে না। অশ্বিনীকুমার এই ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনে আমাদের দেশের জনসাধারণ যেমন ভাবে সাড়া দিয়াছিল তাহা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতে পারে যে, কেহ কেহ দেশের আলোচনা সম্বন্ধে তাহাদিগকে যেমন উদাসীন ও অজ্ঞ মনে করেন, বস্তুতঃ তাহারা তেমন নহে। তাহাদের মনে কৌতূহল উৎপাদন করিতে পারিলে আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনমণ্ডলী রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা যেরূপ ভাবে বুঝিতে পারে, অন্য দেশের সাধারণ লোকের বুঝিবার শক্তি তদপেক্ষা অধিক আমি তাহা মনে করি না। অনেকেই ইহা জানেন যে, বরিশাল ও ময়মনসিংহের রায়তেরা এমন সুবুদ্ধি যে, অতি জটিল মামলাও তাহারা দক্ষতার সহিত চালাইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধিমান্ জনমণ্ডলীর নিকট রাজনৈতিক আন্দোলনের তথ্য জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। এইরূপ অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর মধ্যে আমি বহুবার বক্তৃতা করিয়া দেখিয়াছি

যে, তাহারা আমার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বেশ ধারণা করিতে পারিয়াছে। ১৮৮৫ অব্দের শেষভাগে অথবা ১৮৮৬ অব্দের প্রারম্ভে আমি প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কতকগুলি সভায় জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তখন বরিশাল জিলা হইতে যাহারা লিখিতে পারে এমন চল্লিশ-হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভায় প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮৮৭ অব্দে মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে ঐ আবেদন প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ আন্দোলনের সময়ে একদিন কয়েকটি কৃষক আসিয়া ঐ বিষয়টা কি তাহা আমার নিকট জানিতে চাহে। আমি যখন ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব এমন সময়ে এক নিরক্ষর ব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ওহে, ব্যাপারটা কি আমি বুঝাইয়া দিতেছি। বিবাদ মিটাইবার জন্য আমরা যেমন নিজের মনের মত লোককে শালিস নিযুক্ত করি, এই বিষয়টিও ঠিক সেইরূপ। বাবু বলেন যে, আমরা সরকারের নিকট এই প্রার্থনা করিব যে, আমাদিগকে যে সকল আইন মানিতে হয় সেই সকল আইন আমাদের নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপকগণ প্রণয়ন করিবেন। তাঁহারা যদি আমাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন তাহা হইলেই আমাদের পরামর্শ শুনিবেন এবং আমাদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।" এই অক্ষরপরিচয়শূন্য লোকটি যেমনভাবে তাহার সঙ্গীদিগের নিকট সোজা-

ভাবে আমার বক্তব্য জানাইল আমি তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।”

১৮৮০ অব্দে আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে আসিয়া ওকালতী ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন তখন হইতেই দেশহিতকর তাবৎ আন্দোলনের সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি এবং সংশ্রব ছিল। যুবক অশ্বিনীকুমার যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখনই বঙ্গের রাজনৈতিক গুরু দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, নিখিল ভারতের সৌভাগ্যবশতঃ সিবিল সার্বিস হইতে বরখাস্ত হইয়া, আপনাকে দেশসেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশবাসীর আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক দাবী আলোচনার জন্য তেজস্বী সুরেন্দ্রনাথ, পরলোকগত আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশহিতৈষী মহানুভব ব্যক্তিগণ ভারতসভা (Indian Association) স্থাপন করেন। শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় ভারতসভায় প্রথম সভাপতি এবং মহাত্মা আনন্দ মোহন বসু প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে তখন নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল। দেশহিতৈষী সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা তখন যুবকদের হৃদয়ে আশা ও আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিত। এই পরিবেষ্টনের মধ্যে অশ্বিনীকুমার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি ভারতের প্রায় সমস্ত প্রবীণ দেশ-সেবকগণের গুরু সেই সুরেন্দ্রনাথই

অশ্বিনীকুমারের হৃদয়ে স্বদেশসেবার পবিত্র বহ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন।

১৮৮৫ অব্দে বোম্বাই নগরে ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু হিউম সাহেবের উৎসাহে বোম্বাইর সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলেঙ্গ ও দিন্‌সা ওয়াচার উদ্যোগে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভায় পরলোকগত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য হইল—(১) ভারতবর্ষের নানাজাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা (২) নিখিল ভারতের নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধান (৩) ভারতের উন্নতির পথে যত প্রকার বাধা আছে বৈধ আন্দোলন দ্বারা সেইগুলিকে দূর করিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই দুই রাজ্যের মধ্যে সখ্যতাস্থাপন করা।

জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বঙ্গের মনীষিগণের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নিখিল ভারত একই উদ্দেশ্যে একযোগে চেষ্টা না করিলে এই দেশের অভ্যুত্থানের আশা নাই। নিখিল ভারতবাসীকে এই ঐক্যমন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশসেবায় সর্ব্ব প্রথমে আহ্বান করিয়াছিলেন স্বনামধন্য আনন্দমোহন ও তেজস্বী সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ অব্দে ইঁহারা কলিকাতার ভারতসভার পক্ষহইতে এক জাতীয়

মহাসভা ( National Conference ) আহ্বান করেন। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখস্থ এলবার্ট হলে ২৮এ, ২৯এ, এবং ৩০এ ডিসেম্বর এই তিন দিন সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বৃহৎ বৃহৎ নগর হইতে প্রায় একশত প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বসু মহাশয় এই সভার প্রারম্ভ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"অদ্য এইখানে ভারতের জাতীয় পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠার সূচনা করা হইল।" ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাই নগরে যখন জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইতেছিল ঠিক ঐ সময়ে কলিকাতা নগরে ন্যাশন্যাল্ কন্ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেছিল। এইজন্য সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি বঙ্গের উৎসাহী দেশ-সেবকগণ জাতীয় মহাসমিতির সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। ন্যাসন্যাল্ কন্ফারেন্স, এবং ন্যাসন্যাল্ কংগ্রেস এই উভয় সভারই উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিল বলিয়া উভয় সভার সভ্যগণ সাগ্রহে জাতীয় মহাসমিতির সেবক হইলেন। অশ্বিনীকুমার জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই দেশহিতকর সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার পর হইতে তিনি বঙ্গীয় রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পতাকাতলে দেশ-সেবক দলভুক্ত হইয়া নীরবে দেশমাতার সেবা করিতেছিলেন।

১৮৮৬ অব্দে কলিকাতা নগরে জাতীয় মহাসমিতির দ্বিতীয়

বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে মহাউৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় জমিদারবর্গের শিরোমণি বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে দাদাভাই নৌরজী মহাশয় এই মহাসমিতির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই মহাসভায় বঙ্গীয় যুবকদের সহিত শিক্ষিত প্রবীণগণও সাগ্রহে যোগদান করিয়া দেশের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। যুবক অশ্বিনীকুমার এই সময়ে উৎসাহী দেশ-সেবক বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার পরবৎসর মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। অশ্বিনীকুমার এই অধিবশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই বৎসর বঙ্গীয় প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশইণ্ডিয়া ষ্টিম নেভিগেসন কোম্পানীর এক জাহাজে মহানন্দে কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথে মান্দ্রাজ গমন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ স্যর রাজবিহারী ঘোষ, কিশোরীলাল গোস্বামী সেই বৎসর প্রতিনিধি দলভুক্ত ছিলেন। জাহাজে প্রতিনিধিগণ মহানন্দে নবজাত জাতীয় মহাসমিতির এবং জননী ভারতভূমির মহাভবিষ্যৎ আলোচনা করিয়া সময় যাপন করিতেন। এই প্রসঙ্গ ব্যতীত কাহারও মুখে অন্য কোন কথা বড় শুনা যাইত না।

১৮৮৬ হইতে ১৯০৫ অব্দ পর্য্যন্ত জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলন প্রায় একই ভাবে চলিয়াছিল। ১৮৯৭ অব্দে

বেরারের রাজধানী অমরাবতীতে (স্যর) শঙ্কর নেয়ারের সভাপতিত্বে মহাসমিতির যে অধিবেশন হয় সেই সভায় অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসকে "তিন দিনের তামাসা" বলিযা ফেরোজসাহ মেটার নিকট যে দুর্ব্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার বলিতেন —"বৎসরব্যাপী আন্দোলনের দ্বারা মহাসমিতির বাণী পল্লীবাসী জনমণ্ডলীর মনে মুদ্রিত করিতে না পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে না।" অশ্বিনীকুমার মুখে যাহা বলিতেন কাজে তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি তাঁহার কর্ম্মভূমি বরিশাল জিলার অধিবাসীদের মনে দেশাত্মবুদ্ধি জাগাইবার জন্য স্বীয় শক্তি ও অবসর মত চেষ্টা করিতে কখনও ক্রটী করেন নাই।

## বঙ্গব্যবচ্ছেদ

১৯০৫ অব্দ বঙ্গের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় বৎসর বলিয়া উক্ত হইতে পারে। ঐ অব্দের ১৬ই অক্টোবর, বাঙ্গলা ৩০এ আশ্বিন ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন—"ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ আসামের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক প্রদেশ হইল—ঢাকা হইল ইহার রাজধানী। প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ পূর্ব্ববৎ বিহার ও উড়িষ্যার সহিত মিলিত থাকিয়া বঙ্গদেশ নামে কথিত হইল।" বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর

লইয়া তখন যে সুবৃহৎ বঙ্গদেশ ছিল, ভারতের জবরদস্ত বড়লাট্ লর্ড কার্জ্জন শাসনের সুবিধার দোহাই দিয়া জনমতের বিরুদ্ধে উহাকে স্বেচ্ছামত দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তখনকার বঙ্গদেশ যে বৃহৎ ছিল এবং উহার শাসনসংক্রান্ত কাজ যে একজন ছোটলাটের পক্ষে অধিক ছিল, ইহা কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়লাট্ লর্ড কর্জ্জন বঙ্গভাষাভাষী উন্নতিশীল একটি জাতিকে আপনার যেমন অভিরুচি তেমন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মনে এমন বেদনা দিয়াছিলেন যে, সেই বেদনায় ছোটবড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে সমবেতভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯০৩ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর ভারতগভর্ণমেণ্ট যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তখন হইতেই বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র উহার প্রতিবাদ হইতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ৭০ সহস্র স্বাক্ষর সম্বলিত এক প্রতিবাদ পত্র ভারতসচিব মহোদয়সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯০৫ অব্দের ১৬ই অক্টোবরের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে ছোটবড় দুই সহস্র সভায় ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। কিন্তু দাম্ভিক লর্ড কার্জ্জন জনমণ্ডলীর কাতরতাপূর্ণ প্রতিবাদে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে স্বীয় মতে আনিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে পূর্ব্ববঙ্গ জমিদার সভার আহ্বানে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তি কলিকাতার লাট-সদন ‘বেল্‌ভেডিয়ারে’

আহূত হইলেন। স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজারের সভাপতিত্বে কয়েকটি পরামর্শ সভা হইল। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখন লর্ড কার্জ্জন স্বীয় ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকা ও ময়মনসিংহে গমন করেন। ময়মনসিংহে তিনি মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি রাজপ্রতিনিধিকে রাজোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া ধীরভাবে দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দিয়াছিলেন—"বঙ্গব্যবচ্ছেদ করা হইলে উহাকে আমি অতি ভীষণ বিপদ্ বলিয়া মনে করিব।" বাঙ্গালী বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ চায় না, ইহা জানিতে পারিয়াও নাছোড়-বন্দ লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গলা ভাগ করিবেন স্থির করিলেন। পার্লামেণ্টে বঙ্গব্যবচ্ছেদের যে প্রস্তাবনা তিনি দাখিল করিয়াছিলেন সেই প্রস্তাবনা বঙ্গদেশবাসী এক ব্যক্তিও জানিতেন না। উহা গোপনে স্থিরীকৃত ও আলোচিত হইয়াছিল। ১৯০৫ অব্দের ২০এ জুলাই যখন অকস্মাৎ বঙ্গব্যবচ্ছেদের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় তখন ঐ সংবাদে সকলে স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। নিখিল বঙ্গের দুইবৎসরব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ, আবেদন, নিবেদন সমস্ত দম্ভভরে পদদলিত করিয়া লর্ড কার্জ্জন আপনার খেয়ালকেই জয়যুক্ত করিলেন। বাঙ্গালী এই অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। শান্ত ও নিরীহ বাঙ্গালীর মনে তখন এই সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল যে, যেমন করিয়া হউক গভর্ণমেণ্ট যাহাতে বঙ্গব্যবচ্ছেদ আজ্ঞা বাধ্য হইয়া রহিত করেন, সেইরূপ কিছু করিতেই

হইবে।  এই শুভ সঙ্কল্প হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব হয়।

পাবনা সহরে এক প্রতিবাদ সভায় সর্ব্বপ্রথম বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের কথা উঠে, মফঃস্বলে আরও কয়েকটি সহরে ঐরূপ প্রসঙ্গ উত্থিত হয়।  এই সময়েই শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রস্তাব করিলেন,—'যতদিন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত করা না হয় ততদিন বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করা হউক।' ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলের বিরাট্ সভায় ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন—'যেহেতু ব্রিটিশ জনসাধারণ ভারতীয় প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং বর্ত্তমান ভারত-গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনমতের প্রতি সর্ব্বথা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন সেই হেতু উহার প্রতিবাদার্থ এই সভা মফঃস্বলের সভাসমূহে প্রস্তাবিত ব্রিটনজাত দ্রব্যসমূহবর্জ্জনের অস্থায়ী বিধি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেছেন।

এই বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলনই ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয়।  এই সময়ে বাঙ্গালীর ঐক্যকে চিরন্তন করিবার জন্য কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে বঙ্গ-বিভাগের দিন ৩০এ আশ্বিনকে 'রাখী বন্ধনের' দিন করা হয়।  এই উপলক্ষ্যে কবিবর তাঁহার 'বাংলার মাটী, বাংলার জল' এই অমর সঙ্গীতটি বঙ্গদেশবাসীকে উপহার প্রদান করেন।

## বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অশ্বিনীকুমার স্বীয় অনন্য সুলভ কর্ম্মশক্তি ও মণ্ডলীগঠনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের এককোণে বরিশাল জিলায় তিনি আন্দোলনের যে বহ্নি জ্বালাইয়াছিলেন উহার তীব্রদীপ্তি ভারতের তদানীন্তন রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মিন্টোর চক্ষু ঝলসিয়া দিয়াছিল। তিনি লর্ড মর্লীকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"সীমান্ত সৈন্যবিভাগ এবং বরিশাল-সমস্যা আমাকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।" ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি এতদিন কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু আদর্শ শিক্ষক বলিয়া পূজিত হইতেন সেই অশ্বিনীকুমার এই সময়ে সমগ্র বরিশাল জিলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর মুকুটহীন রাজার পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সাধারণ দোকানদারও জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই কথা জানাইতে ভীত হইত না যে, আপনার আদেশে এক টুক্‌রাও বিলাতী কাপড় বিক্রয় করিতে পারিনা, আর যদি অশ্বিনী বাবু আদেশ করেন ত বিক্রয় করিতে পারি।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বার্ত্তা প্রচারিত হইবার পরে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য বরিশাল সহরে প্রবীণদের এবং যুবকদের দুইটি দল গঠিত হইয়াছিল। প্রবীণদের দলটি নেতৃসঙ্ঘ এবং যুবকদের দলটি কর্ম্মিসঙ্ঘ আখ্যা প্রাপ্ত

হইয়াছিল। অতি সরল ভাষায় লোকসাধারণকে বঙ্গ-বিভাগের অপকারিতা বুঝাইয়া দিবার জন্য অশ্বিনীকুমার তাঁহার অনুরাগী কতিপয় যুবককে আদেশ করিয়াছিলেন। এই দলে শিক্ষক ও উকীলে আঠারটি যুবক ছিলেন। ইহারা বরিশালের রাজপথে বক্তৃতা করিতেন। নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য এই যুবকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হন। এই দলটির নাম হইল কর্ম্মিসঙ্ঘ। ডাক্তার নিশিকান্ত বসু এই সঙ্ঘের প্রথম সম্পাদক। অশ্বিনীকুমারের অভিপ্রায়ে এই দলটির উদ্ভব হইলেও প্রথমে কিছুকাল তিনি এই দলের সহিত কার্য্যতঃ যোগদান করিতে পারিতেন না। তখন তিনি ছিলেন ইহাদের পরামর্শ-দাতা। অশ্বিনীকুমারকে তখন বরিশালের প্রবীণদের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে হইত। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত, উকীল শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ, জমিদার উপেন্দ্রনাথ সেন, উকীল দীনবন্ধু সেন, উকীল রজনীকান্ত দাস, জমিদার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী ও অশ্বিনীকুমায় প্রভৃতি বরিশালের অল্প-সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি নেতৃসঙ্ঘের সভ্য ছিলেন। ইহাদের পাঁচ নেতার স্বাক্ষরিত একখানি পুস্তিকা বরিশাল জিলার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তিকায় নেতৃগণ দেশবাসী জনমণ্ডলীকে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশ-জাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাহাতে হাটে বাজারে বিলাতী লবণ, বিলাতী

কাপড়, চিনি, মনোহারী দ্রব্য এবং মদ্য বিক্রয় না হয় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার বৈধ চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই প্রচেষ্টার সফলতা যত অধিক হইতেছিল রাজকর্ম্মচারীদের রোষ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লাট্ ফুলারের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বরিশালবাসীকে ভয় দেখাইবার জন্য রোটাস্ জাহাজে বরিশাল সহরে উপস্থিত হইলেন। তিনি পাঁচ জন নেতাকে তাঁহার জাহাজে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের প্রচারিত পুস্তিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ধমক দিয়া বলিলেন —You are playing with fire, সাবধান হইবেন, আপনারা আগুন লইয়া খেলিতেছেন। তখন তিনি নেতাদিগকে একে একে উক্ত পুস্তিকা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। একজন বলিলেন—'আমাদিগকে ভাবিবার জন্য একটু সময় দিন।' উহাতে লাট্ ফুলার অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি কোন কথা শুনিব না, বলুন প্রত্যাহার করিবেন কি না? বলুন, হাঁ, বা না। ছোট লাট্ বাহাদুরের ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহারা একে একে সম্মতি দিলেন। সর্ব্বশেষে অশ্বিনীকুমারকেও অনিচ্ছায় সহকর্ম্মীদের মতে মত দিতে হইল।

কিছুদিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্যাক্ সাহেব এইরূপ এক ইস্তাহার প্রচার করেন যে, অশ্বিনীকুমার প্রমুখ নেতৃগণ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারমূলক যে ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন, রাজদ্রোহমূলক বলিয়া তাঁহারা উহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

অশ্বিনীকুমার ইহার প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে, ইস্তাহার রাজদ্রোহমূলক বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন নাই, কেবল লাট্ সাহেবের অনুরোধে উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এই জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্যাক্ সাহেব অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহাকে ১০১৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল।

এই ব্যাপারটি তখন বরিশালবাসী জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল। বলাবাহুল্য নেতৃবৃন্দের এই আচরণে জনসাধারণ বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর নেতৃসঙ্ঘের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। অশ্বিনী-কুমার কর্ম্মিদলের যুবকদের সহিত মিলিত হইয়া আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। কর্ম্মিদল তখন 'স্বদেশ-বান্ধব-সমিতি' আখ্যা প্রাপ্ত হইল এবং অশ্বিনীকুমার হইলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি।

এই সময়ে নিশিবাবু স্বেচ্ছায় স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির প্রচারক পদ গ্রহণ করেন। ইহার পরে দুইজন মুসলমান এবং আর একজন হিন্দু প্রচারক নিযুক্ত হন। প্রচারকগণ মহোল্লাসে গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া জনসাধারণকে স্বদেশীর নূতন বাণী শুনাইতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র আশা, আনন্দ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ১৯০৫ ও ১৯০৬ অব্দে অশ্বিনীকুমার স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। হাটে বাজারে যাহাতে বিলাতী জিনিষের ক্রয় বিক্রয় না হয় তজ্জন্য তিনি হাটের মালিক জমিদারদিগকে পত্র লিখিলেন।

এই সময়ে বরিশাল সহরে সর্ব্বপ্রথম জিলাকন্‌ফারেন্স হয়। কন্‌ফারেন্সের কার্য্যে যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া আশীটি গ্রামের প্রতিনিধির নাম পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের দ্বারাই অশ্বিনীকুমার গ্রামে গ্রামে স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রচারকগণও মফঃস্বলে গমন করিয়া শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বত্র আন্দোলন প্রসারিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সমগ্র জিলায় দেড়শতেরও অধিক শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এতন্মধ্যে প্রায় একশত শাখায় নিয়মিত ভাবে সংবৎসরব্যাপী কার্য্য হইত। অপরগুলি প্রয়োজন মত কার্য্য করিতেন। পল্লীর এই সমিতিগুলিতে প্রয়োজন মত কার্য্য করিবার জন্য ৫০ জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক থাকিত। সুতরাং প্রয়োজন হইলেই দুই একদিন মধ্যে অশ্বিনীকুমার প্রায় পাঁচ সহস্র স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—"তখন সমগ্র বরিশাল এক নেতার অঙ্গুলীহেলনে পরিচালিত হইত। একটি কল টিপিয়া দিলে যেমন হাজার হাজার বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠে, তেমন বরিশালের লক্ষ লক্ষ লোকের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইত অশ্বিনীকুমারের ইচ্ছাদ্বারা।" এই যে সমগ্র জিলাব্যাপী এক বিরাট্ মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল ইহার মূলে ছিল (১) অশ্বিনীকুমারের অসামান্য চরিত্রের

প্রভাব। সমগ্র জিলার লোক অশ্বিনীকুমারের কথা একবাক্যে মানিত। এমন ভাবে বঙ্গদেশে অপর কোন নেতা লোকসাধারণের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। (২) স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির সভ্যদের মধ্যেও একপ্রাণতা ছিল। তাঁহারা স্ব-স্ব প্রধান না হইয়া সকলেই অশ্বিনীকুমারের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চলিতেন। তাঁহাদের সকলেরই মন ছিল কাজের দিকে, নাম জাহির করিবার স্পৃহা কাহারও ছিল না। (৩) এই সময়ে বরিশালে স্বদেশী প্রচার ও বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ করিবার জন্য বেতনগ্রাহী চারিজন এবং অবৈতনিক পঁচিশ জন প্রচারক কার্য্য করিতেন।

স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা দেশের অশিক্ষিত লোক-সাধারণের চিত্ত জয় করিতে হইলে কেবল বক্তৃতার দ্বারা সুফল পাওয়া যাইবে না অশ্বিনীকুমার তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। ঐ জন্য তিনি গ্রামের লোকের সরল ভাষায় জারিওয়ালা মুসলমান দ্বারা স্বদেশী গান লিখাইলেন। ইহাদের গান শুনিয়া পল্লীর নিরক্ষর লোকগণ পরাধীনতার লাঞ্ছনা, উপাধির অসারতা বুঝিয়াছিল। বড় বড় ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদের স্তোক-বাক্য লোকসাধারণ কি মনে করে উহা জানাইবার জন্য জারিওয়ালা মফিজদ্দিন বয়াতি গাহিয়াছিলেন—

> "এ দেবো, ও দেবো ব'লে
> অবশেষে ভুজঙ্গিনীর পা দেখায়।"

লোকসাধারণের মনে স্বদেশীর ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবার

জন্য অশ্বিনীকুমার এই সময়ে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস দ্বারা স্বদেশীযাত্রা রচনা করাইলেন। এই যাত্রা কেবল বরিশাল-বাসীর নহে, সমগ্র বঙ্গদেশবাসীর চিত্ত মাতাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে এই সময়ে স্যর ব্যাম্‌ফাইল্ড্‌ ফুলার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বদেশীদলনের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন। লাট্‌ ফুলার বরিশালবাসীকে ভীত করিবার জন্য সহরে গুর্খাসৈন্যের আমদানী করিয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বরিশালবাসী গুর্খার দ্বারা নিরপরাধে পথে ঘাটে লাঞ্ছিত হইয়াও ভীত হইল না। স্বদেশী যাত্রায় অশ্বিনী-কুমারের শিষ্য লাট্‌ ফুলারকে শুনাইয়া দিলেন—

ফুলার আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে, মনত অধীন নয় ;
হাত বাঁধ্‌বে পা বাঁধবে ধরে না হয় ফাঁসী দিবে,
মনকে বাঁধিতে পার তোমার এমন শক্তি নয়,
ফুলার এমন শক্তি নয়।

অশ্বিনীকুমারের ভাবরাজি তাঁহার শিষ্যরচিত সরল সঙ্গীতে অভিব্যক্ত হইয়া সমগ্র বরিশালবাসীকে অভয়, আশ্বাস ও আনন্দ দান করিতেছিল।

"কথকতা" লোকশিক্ষার একটি বিশিষ্ট উপায়। অশ্বিনীকুমারের অভিপ্রায়ে সুকবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কবিরত্ন কাব্যবিশারদ বরিশালে নূতনভাবের "কথকতা" আরম্ভ করিয়া দেশ-কল্যাণ সাধন করেন। সুললিতকণ্ঠ, বাক্‌চাতুর্য্য

ও অভিনয় নৈপুণ্যে তাঁহার ‘কথকতা’ শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় রঞ্জন করিয়া থাকে। লোকের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে সহৃদয়তাদ্বারা টানিয়া বাহির করিয়া উহাকে মঙ্গলকর্ম্মে নিয়োজিত করিবার শক্তি অশ্বিনীকুমারের প্রভূত পরিমাণে ছিল। কথক হেমচন্দ্র অশ্বিনীকুমারের সংস্পর্শে আসিয়া আপনার ‘শক্তির আস্বাদন পাইয়াছিলেন। কোন্ লোকের দ্বারা কি কাজ করান যাইতে পারে মানুষ দেখিয়া তাহা বুঝিবার ক্ষমতা অশ্বিনীকুমারের ছিল। বরিশালের স্বদেশী আন্দোলনের সার্থকতার ইহাও একটি কারণ। এই প্রসঙ্গে কথক হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"তুমি মোর কত দে'ছ, দে'ছ প্রাণভরি
অসার নির্জ্জীব জড়ে সঞ্চারিলে প্রাণ,
অন্ধজনে করিয়াছ দিব্য চক্ষু দান,
অধমেরে অধিকার দিয়াছ সেবার,
ভিখারীরে চিনায়েছ রতনভাণ্ডার।"

অশ্বিনীকুমারের বুকভরা ভালবাসার আকর্ষণে লোকে তাঁহার চারিদিকে ভিড় করিত, এবং তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের চৌম্বক শক্তি দ্বারা তিনি অনেক লোহাকে চুম্বকে পরিণত করিয়াছেন।

সেই স্বদেশীর যুগেই অশ্বিনীকুমারের মতি ধ্বংস অপেক্ষা গঠনের দিকে বেশী ছিল। স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতার পথে দ্রুতগতি অগ্রসর করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে (১) স্বাস্থ্য (২) শিক্ষা (৩) স্বদেশী ও (৪) সালিসী এই চারিটি

বিষয়ে স্বাবলম্বননীতি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সম্ভবতঃ তিনিই স্বাবলম্বন মন্ত্রের প্রথম উপদেষ্টা। বরিশাল জিলায় অশ্বিনীকুমার স্বদেশবান্ধব-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া যে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন তাহার ফলে ঐ জিলায় ৩কোটী টাকার বিলাতী বস্ত্রের বিক্রয় কমিয়া গিয়াছিল এবং বিলাতী মদের ৫২টি দোকানের ২টির মাত্র অস্তিত্ব ছিল।

বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল উহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, স্বদেশীর যুগে নিখিল বঙ্গের কেবল মাত্র বরিশাল জিলায় কণ্ঠরোধের আইন জারি করিয়া গভর্ণমেণ্ট এই জিলাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

যে কর্ম্মিদলের দ্বারা অশ্বিনীকুমার এতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। স্বেচ্ছা-সেবকগণ হাটে বাজারে লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়াই বিলাতী দ্রব্যবর্জ্জনে তাহাদিগকে সম্মত করিতেন, কিন্তু কদাচ কাহারও উপর জুলুম করিতেন না। কেবল বিলাতী লবণ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইহারা অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে। এই জন্য কয়েকটি কর্ম্মী অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডপ্রাপ্তও হইয়াছিলেন। সে যাহাহউক, সেই মহা উত্তেজনার দিনে ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে যে সংযম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন

তাহা স্মরণ করিয়া এখনও গর্ব্বে বুক ভরিয়া উঠে। কৃষ্ণকাঠী নামক এক গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে সেখানে আসিবার পথ ছিল না, তখন স্বেচ্ছাসেবক ও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নিজেদের হাতে মাটি কাটিয়া দুই হাত চওড়া, সাত মাইল লম্বা রাস্তা বাঁধিয়াছিলেন। স্বদেশীর যুগে স্বরূপকাঠী ও আমরাজুড়ী অঞ্চলে বহুস্থলে স্বেচ্ছাসেবকগণ রাত্রিকালে আপনাদের গ্রামে পাহারা দিয়া চোর গেরেপ্তার করিয়া উহাদিগকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করিতেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রচেষ্টায় বহুগ্রামে সালিশী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

এই স্থলে একটি কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা দরকার— অশ্বিনীকুমারের রাজনৈতিক আন্দোলন কদাচ আইনের সীমা লঙ্ঘন করিত না। গুপ্ত হত্যাদ্বারা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা যায় একথা তিনি কল্পনায়ও মনে স্থান দিতেন না। তিনি ধার্ম্মিক, ধর্ম্মের পথ হইতে তিনি রেখা মাত্র বিচ্যুত হইতেন না। তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ ভ্রমক্রমেও কোন দিন রাজদ্রোহ বা জাতিবিদ্বেষ প্রচার করেন নাই। বক্তারা বঙ্গবিভাগের ইতিহাস বিবৃত করিয়া লোকসাধারণকে বিলাতী কাপড়, বিলাতী লবণ, বিলাতী জিনিষ বর্জ্জন করিয়া ভারত-জাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেন। ইহার মধ্যে কোথায়ও বে-আইনী কিছু ছিল

না। এই আন্দোলন সফলতা লাভ করিয়াছিল—অনেক লোক বিলাতী দ্রব্যের ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একস্থলে পল্লীবাসী এক স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি জনৈক বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"বাবু, আমার বাড়ীতে একটা বিলাতী আমড়ার গাছ আছে, সেটাকে কাটিয়া ফেলিব ?" বক্তা বলিলেন, "না, উহা কাটিতে নাই, উহার নাম বিলাতী আমড়া হইলেও, গাছটা আমাদের এই দেশের মাটিতে জন্মিয়াছে—ওটা দেশী।"

বাকরগঞ্জ জিলায় বিলাতী মদ্য, বিলাতী কাপড়, বিলাতী লবণের কাটতি কমিয়া যাওয়ায় রাজকর্ম্মচারীদের অবর্ণনীয় রোষ জন্মিল। অথচ যিনি শিষ্যদল লইয়া এই কাণ্ড ঘটাইতেছেন তাঁহাকে বা তাঁহার শিষ্যদিগকে দণ্ড দিবার মত কোন অছিলা বা অজুহাত পাওয়া যাইতেছিল না। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্যাক্ সাহেব একদিন অশ্বিনীকুমারের সহযোগী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শিক্ষক শরৎকুমার রায়, ডাক্তার নিশিকান্ত বসু, উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ সেন, ও উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে প্রভৃতিকে স্বগৃহে ডাকিয়া ধমক দিয়া বলিলেন—"আপনাদের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগকে আর কিছুতেই থামান যাইতেছে না, আপনারা কিছু দিনের জন্য বক্তৃতা বন্ধ রাখুন।" অশ্বিনীকুমারের সহযোগীরা জানাইলেন—"আমরা কদাচ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করি না, লোককে বঙ্গবিভাগের কথা বুঝাইয়া দিয়া ভারতজাত

বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে বলি। আমরা যাহা বলি তাহা অবৈধ বা বে-আইনী নহে। আমরা অশ্বিনী বাবুর নিদেশ অনুসারে বক্তৃতা করি, তিনি যদি বক্তৃতা করিতে নিষেধ করেন তাহা হইলে বক্তৃতা বন্ধ করিব, অন্যথা নহে।" ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইহাদের মধ্যে কোন কোন কর্ম্মীকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন, এখানে শান্তিরক্ষার জন্য গুর্খাসৈন্য আনা হইয়াছে, তাহারা যদি আপনাদের উপর অত্যাচার করে ত আমি কিন্তু দায়ী হইতে পারিব না। এই কথার উত্তরে ডাক্তার নিশিকান্ত বসু বলিয়াছিলেন, আপনি যদি আমাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন ত আমাদিগকেই আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘটনার পরদিনই উকীল শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দত্ত এবং ডাক্তার নিশিকান্ত বসু গুর্খাসৈন্যকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। সেই যুগে নূতন বঙ্গে এমনই সব নূতন নূতন কাণ্ড ঘটিত। নিরক্ষর, নির্ম্মম, নির্ভীক গুর্খাসৈন্যগণ বরিশাল সহরে অতি নৃশংস ও বীভৎস অত্যাচার করিয়াছিল, তথাপি বরিশালের বাজারে বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণের ক্রেতা ও বিক্রেতা পাওয়া যায় নাই। বরিশালবাসী লাঞ্ছিত হইয়াও স্বদেশীর পুণ্যসাধনা হইতে রেখামাত্র ভ্রষ্ট হইল না।

অনন্যোপায় হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ বুলার সাহেব নূতন বাজার বসাইলেন। বিলাতী পণ্য বিক্রয়ের এই বাজার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—"সরকারের মর্জ্জি হইলে স্থানেরও অভাব হয়না, টাকারও অকুলন হয় না।

স্থান পাওয়া গেল, সারি সারি দোকান ঘর নির্ম্মিত হইল, এমন কি নহর্বতখানাও প্রস্তুত হইল; বুলার সাহেবের বাজারে কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল কেবল ক্রেতা, বিক্রেতা ও পণ্যের। তামাসা দেখিতেও বরিশালের বালখিল্যেরা বুলারের বাজারে যায় নাই'। সরকারের শক্তি অশ্বিনীকুমারের শক্তিদ্বারা এমনই প্রতিহত হইয়াছিল।"

লাট্ ফুলার এক বক্তৃতায় মুসলমানদিগকে তাঁহার "সুয়োরাণী"অর্থাৎ 'আদরের ঘরণী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য এই যে তাঁহার শাসনকালে ময়মনসিংহ জিলার জামালপুরে এবং কুমিল্লায় হিন্দুমুসলমানে যেরূপ ভীষণ দাঙ্গা হইয়াছিল ঐরূপ দাঙ্গা ঐ সকল অঞ্চলে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। তখন একদল লোক হিন্দুমুসলমানে বিরোধ বাধাইয়া স্বদেশী আন্দোলনটিকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিত। বরিশাল জিলায় এইরূপ বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা ঝালকাটী-বন্দরে এবং ফুলঝুড়ীতে হইয়াছিল। ঢাকা হইতে একদল মৌলবী বরিশালে আসিয়াছিল। ঝালকাঠীতে তাহারা মুসলমানদিগকে যাহা বলিয়াছিল উহার মর্ম্ম এই—হিন্দুরা সকল কার্য্যে তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের সকল কাজ উল্টা, তোমরা পশ্চিম মুখ হইয়া নামাজ কর, তাহারা পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্ধ্যাপূজা করে। তোমরা কলাপাতায় যে পিঠে খাও, তাহারা তার উল্টা পিঠে খায়। ইহাদের সঙ্গে তোমরা কেন মিলেমিশে থাক?" ইহার উত্তরে এক প্রবীণ মুসলমান

বলিলেন—"দেখুন, হিন্দুরা আমাদের প্রতিবেশী, তাদের সঙ্গে বারমাস থাকি, বিপদে আপদে হিন্দুরা আমাদের পাশে দাঁড়ায়। দেখুন, আমার ক্ষেতে যে ধান হয় তাহা বেচি হিন্দুর কাছে, আমার ভাইর গরু কয়টায় যে দুধ হয় তাহাও হিন্দুরাই কিনে, এই হিন্দুদের সঙ্গে বিবাদ করিলে আমরা বাঁচিব কি প্রকারে ?"

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"ঢাকার নবাব বাহাদুর হুকুম দিলেন, তাহার একটা হাটে ( বরিশাল জিলার ) বিলাতী লবণ ও বিলাতী কাপড়ের দোকান বসিবে। কাহারও নিষেধ তিনি মানিবেন না। অশ্বিনীবাবুর হুকুমে অগত্যা নদীর অপর পারে নূতন হাট বসিল। তখন বিলাতী সংস্পর্শ-দুষ্ট পুরাতন হাট নবাবের হুকুম বজায় রাখিতে গিয়া একেবারেই পরিত্যক্ত হইল। সে অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান। নবাবের কর্ম্মচারীরা প্রভুর হুকুম জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল; কি আশ্চর্য্য তোমরা মুসলমান, তোমরা একটা হিন্দুর হুকুমে নবাবের হুকুম অমান্য কর? সরল কৃষকেরা হিন্দুমুসলমানের স্বার্থসংঘাতের খবর রাখে না। তাহারা সাম্প্রদায়িক ভেদবিবাদের ধার ধারে না। তাহারা জানে—অশ্বিনীবাবুই তাহাদের একমাত্র বন্ধু, তাহারা নির্ভয়ে জবাব দিল—"আপদে বিপদে রক্ষা করেন 'বাবু', আকালের (দুর্ভিক্ষের) সময়ে অন্ন পাঠাইয়া দেন তিনি। গ্রামে ওলাউঠা লাগিলে ঔষধ ও চিকিৎসক পাঠাইয়া দেন

তিনি। এত কালত কই, নবাব আমাদের কোন খোঁজ রাখেন নাই। আজ তাঁহার হুকুমে 'বাবুর' মনে ব্যথা দিলে খোদা নারাজ হইবেন।" অশ্বিনীকুমার বাকরগঞ্জ জিলার হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনমণ্ডলীর তুল্য-প্রিয় ছিলেন।

স্বদেশীর যুগে একসময়ে বরিশালবাসী জনমণ্ডলী মুসলমান আক্রমণের কাল্পনিক আতঙ্কে যেরূপ একপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল উহাও অশ্বিনীকুমারের মণ্ডলীগঠনের সাফল্যের অমোঘ পরিচয় প্রদান করে। একদিন সন্ধ্যার পরে হঠাৎ বরিশালবাসী জনমণ্ডলী নগরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ কাশীপুরের দিক্ হইতে একটা অস্বাভাবিক কোলাহল শুনিতে পাইল। জামালপুর ও কুমিল্লার মুসলমান গুণ্ডাদের বীভৎস অত্যাচার কাহিনী স্মরণ করিয়া নগরবাসী আতঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজেদের ধন প্রাণ ও নারীদের সম্মান রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। অত্যল্প কাল মধ্যে দুই সহস্র স্বেচ্ছাসেবক লাঠি, রামদাও প্রভৃতি হস্তে লইয়া গুণ্ডাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য কাশীপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। একজন অশ্বপৃষ্ঠে তথ্যনির্ণয়ের জন্য ছুটিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ বুলার সাহেব নগরবাসীদের এই তুমুল চাঞ্চল্যের সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কাশীপুরের পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি হঠাৎ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা

দল বাঁধিয়া এই বেশে এসময়ে কোথায় যাইতেছ ?'' উত্তর হইল, "আত্মরক্ষা করিতে।'' সাহেব বলিলেন—"আরে, তোমাদের ভয় কি, আমি আছি, আমিই তোমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।" তাঁহারা বলিলেন—"সাহেব, আজ তোমার কথা শুনিব না, তোমার ইচ্ছা হয়ত কাল দণ্ড দিও, আজ আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা করিতেই হইবে।"

ইহাদিগকে থামাইতে না পারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বরিশালের আসল কর্ত্তা অশ্বিনীকুমারের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি আসিয়া গাড়ীর ছাদে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে নির্ভয়ে গৃহে ফিরিতে আদেশ করিবামাত্র তাঁহারা নীরবে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দেড় ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ আসিয়াছিল, মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণভীতি সম্পূর্ণ অলীক।

বাঙ্গলা ভাষায় জনসাধারণের পাঠোপযোগী রাজনৈতিক সাহিত্য নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার স্বদেশী অন্দোলনের সময় তাঁহার অনেক শিষ্যকে ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস, ইটালীর স্বাধীনতার ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, হাঙ্গেরীর ইতিহাস, আধুনিক জাপানের ইতিহাস, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের ইতিহাস, মারাঠা জাতির ইতিহাস, শিখজাতির ইতিহাস, রাজপুতদিগের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

সমগ্র জিলার এই স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন হইত। আমরা জানি এই জন্য

অশ্বিনীকুমার কখনও অর্থাভাব অনুভব করেন নাই। তখন জনসাধারণ স্বেচ্ছায় সাগ্রহে যে চাঁদা দিত উহাতেই এই আন্দোলনের ব্যয় চলিয়া যাইত। ঝালকাঠী বন্দরের ব্যবসায়ীরা তখন টাকাপ্রতি অর্দ্ধপয়সা "বন্দেমাতরং বৃত্তি" তুলিয়া সেই অর্থ কয়েক বৎসর প্রদান করিয়াছিলেন। স্বদেশীযুগে বরিশাল সহরে দুইবার জিলা কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমবারের সভায় বরিশালবাসীর আহ্বানে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ডাক্তার গফুর প্রভৃতি দেশনায়কগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার গফুর স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বরিশাল জিলার কয়েকটি গ্রামে গমন করিয়া স্বদেশী প্রচার করিয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশভক্ত অশ্বিনীকুমারকে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট কি চক্ষে দেখিতেন স্যর ব্যাম্‌ফাইল্ড ফুলারের লিখিত একখানি পত্রে পাঠকগণ উহার পরিচয় পাইতে পারেন। কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে তিনি অশ্বিনীকুমারকে স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—

GOVERNMENT HOUSE,
*Shillong, 14-8-1906.*

DEAR SIR,

Before leaving India I must write to beg of you, for your country's sake, to take the opportunity, that my resignation affords, of abandoning a position of hostility to the British Government which must be fraught with evil consequences. It has been a matter of deep regret to me that you should have taken so prominent a stand in opposing a Government which only needs the co-operation of leaders of the people to benefit the country very greatly : I have been hoping all along that you would re-consider your position. For you are, I am aware, not one of those who render to their country lip-service only. To the cause of education you have devoted practical and successful effort, remembering that philanthrophy is shown by deeds. I beg that you will reflect upon the situation and upon the harm, which the agitation is causing to the youth of your people and emphasise the selfdenial you have practised in the past–an act of renunciation, which however distasteful to you, will be for lasting benefit to those whose interest you have at heart.

Yours truly
(Sd) Bamfylde Fuller

যে আন্দোলন-দ্বারা অশ্বিনীকুমার শত শত যুবকের অন্তরে স্বদেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিলেন, লাট্ ফুলার মনে করিতেন সেই আন্দোলনদ্বারা অশ্বিনীকুমার গভর্ণমেণ্টের সহিত শত্রুতা করিতেছেন এবং যে-সকল যুবকের কল্যাণ সাধন করিতে তিনি অভিলাষী এই আন্দোলন-দ্বারা তিনি তাহাদেরই অনিষ্ট করিতেছেন। এই সকল বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমার স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন, ইহাই লাট্ সাহেবের অনুরোধ।

বলা বাহুল্য অশ্বিনীকুমার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি অতি সুস্পষ্ট বাক্যে স্যর ব্যাম্‌ফাইল্ড ফুলারকে জানাইয়াছিলেন—"গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমি কোন প্রকার শত্রুতার ভাব পোষণ করি না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের যে-সকল কার্য্য আমার মতে অন্যায় আমি সেই সকল কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া পারি না।"

## বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি

১৯০৬ অব্দে বরিশাল সহরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। এই সমিতিতে যোগদানার্থ গমন করিয়া স্বদেশসেবক শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ রুষ্ট রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা রাজপথে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করিবার অপরাধে লাঞ্ছিত হইয়া-ছিলেন। এইজন্য এই সমিতির স্মৃতি এখনও রক্তাক্ষরে

বাঙ্গালীর মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র বঙ্গে তখন যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই উত্তেজনা হইতেই বাঙ্গালীর নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। এই সময় হইতে রাজনীতিক আন্দোলনের ধারা প্রাচীন পন্থা পরিহার করিয়া নূতন পথে প্রধাবিত হয়।

১৯০৫ অব্দে ময়মনসিংহ সহরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে বাকরগঞ্জ জিলার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন পরবর্ত্তী বর্ষের অধিবেশন বরিশাল সহরে আহ্বান করেন। তখন হইতেই অশ্বিনীকুমার এই সভার সাফল্যের উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, দরিদ্র বরিশাল জিলাবাসীদের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে সভার অধিবেশন হইবে উহাকে তিনি দুই তিন দিনের তামাসা হইতে দিবেন না। এই উপলক্ষ্যে তিনি বরিশাল জিলার প্রত্যেক পল্লীতে প্রাদেশিক সমিতির বার্ত্তা প্রচার করিতে অভিলাষী হইলেন। বর্ষাকালেই তিনি বরিশাল সহরে এক জনসভার অধিবেশন করিয়া ৩৫ জন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিটি গঠন করেন। বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি উকীল রজনীকান্ত দাস মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ কাল হইতেই অশ্বিনীকুমার তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুত শরৎকুমার রায়কে গ্রামে গ্রামে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের কথা শুনাইবার জন্য

প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কমিটি তাহার প্রতি প্রাদেশিক সমিতির কথা প্রচারের ভারও অর্পণ করেন। এই জন্য শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য নামক অপর এক জন প্রচারকও নিযুক্ত হন। প্রচারকদ্বয় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পল্লীবাসী জনমণ্ডলীকে দেশের বাণী শুনাইয়া প্রাদেশিক সমিতির কথা জানাইতে লাগিলেন। কয়েকমাস মধ্যে বাকরগঞ্জ জিলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রাদেশিক সমিতি ও স্বদেশীর মঙ্গল মন্ত্র প্রচারিত হইল। যাহাতে পল্লীর দরিদ্রতম ব্যক্তিও প্রাদেশিক সমিতির উদ্দেশ্য অবগত হইয়া এই সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাহার সাধ্যানুরূপ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করে, তৎপক্ষে যথা-সম্ভব চেষ্টা করা হইল। বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি যাহাতে বাস্তবিকই বরিশাল জিলাবাসী জনমণ্ডলীর সমিতি হয় তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টার ক্রুটী হইল না। এই প্রাদেশিক সমিতিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির সভা বলিবার উপায় রহিল না। অশ্বিনীকুমার কেবল প্রচারক পাঠাইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। বঙ্গব্যবচ্ছেদ, স্বদেশী এবং প্রাদেশিক সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতি সরলভাষায় পুস্তিকা লিখিয়া তিনি দুইবার বহু সহস্র পুস্তিকা প্রচার করিলেন। অতঃপর শারদীয় পূজাবকাশ সময়ে অশ্বিনীকুমার তাঁহার সহযোগী শিক্ষক ও উকীলদিগকে লইয়া নানাদিকে সমিতির বাণী প্রচার করিয়া অর্থসংগ্রহার্থে বাহির হইলেন। অশ্বিনীকুমার বাটাজোর, গৈলা, বাকাল প্রভৃতি

অঞ্চলে অদম্য উৎসাহসহকারে সকলকে প্রাদেশিক সমিতির মঙ্গলকর উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। বাকরগঞ্জ জিলার অধিবাসীরা শিক্ষিত যুবকদের মুখে স্বদেশী ও প্রাদেশিক সমিতির বাণী শ্রবণ করিয়া অভূতপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত হইল। সকলেই মহা উৎসাহের সহিত প্রাদেশিক সমিতির সাহায্য কল্পে সাধ্যানুরূপ অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

১৯০৬ অব্দের প্রারম্ভে বাকরগঞ্জ জিলার নানাস্থানের চাঁদাদাতা এবং উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে লইয়া বরিশালনগরে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় অশ্বিনীকুমার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং উকীল রজনীকান্ত দাস মহাশয় সম্পাদক বৃত হন। প্রাদেশিক সমিতি-সংক্রান্ত কার্য্যাবলীকে (১) সংবাদ ও লিপি (২) মণ্ডপ (৩) বাসস্থান (৪) খাদ্যদ্রব্য ও সরবরাহ (৫) অভ্যর্থনা এই কয়ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের ভার উপযুক্ত সহকারী সম্পাদকগণের উপর অর্পিত হইল। ব্রজমোহন কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র স্বেচ্ছা-সেবকদলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

সকলেই অবগত আছেন যে, এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট বিদ্যার্থীদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সার্কুলার জারি করিয়াছিলেন। এদিকে সঙ্কল্পিত মহাসভায় কার্য্যসাধনের

জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবকের দরকার। ছাত্রদিগকে এই কার্য্যে গ্রহণ না করিলে উপযুক্ত-সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক কোথায় পাওয়া যাইবে? সমিতির উদ্যোক্তারা এক মহা সমস্যায় পতিত হইলেন।

পুরুষ-সিংহ অশ্বিনীকুমার তখন দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করিলেন— "কোন ছাত্র যদি নিজের ইচ্ছায় স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইতে চাহে আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কলেজের ছাত্রগণ স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিলে আমার কলেজের যদি কোন অনিষ্ট হয়, এমন কি কলেজ যদি উঠিয়াও যায় আমি তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইব না।" অশ্বিনীকুমারের এই অভয়বাণী প্রচারিত হইবার পর দলে দলে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক দল-ভুক্ত হইল। দেখিতে দেখিতে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা তিনশত হইল।

১৮৯৫ অব্দ হইতে বঙ্গদেশের নানা নগরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, গুরুপ্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকা-চরণ মজুমদার, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, কাশিমবাজারের মহারাজা, জগদীন্দ্রনাথ রায়, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বঙ্গের সুসন্তানগণ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এত বৎসরমধ্যে কোন বিশিষ্ট মুসলমান এই সভায় সভাপতির পদে বৃত হন নাই। অশ্বিনীকুমার কোন বিশিষ্ট মুসলমানকে এই পদে বরণ করিবার অভিলাষী হইলেন।

অশ্বিনীকুমার আমরণ হিন্দু-মুসলমান মিলনমন্ত্রের প্রচারক ছিলেন। কলিকাতার নেতাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া অভ্যর্থনা সভা কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল সাহেবকে সভাপতি মনোনীত করেন। ১৯০৬ অব্দের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল (১৩১৩ সালের ১লা ও ২রা বৈশাখ) প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের তারিখ নির্দ্ধারিত হয়। এই সমিতির জন্য আটসহস্র লোকের উপযোগী একখানি সুবৃহৎ সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বঙ্গের প্রত্যেক জিলা হইতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি বরিশালের কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য সাগ্রহে আগমন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের লাট্ ফুলার সাহেব আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসিত প্রদেশে কোন ব্যক্তি প্রকাশ্য পথে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করিতে পারিবে না। যাহাতে লাট্ সাহেবের এই আদেশ লঙ্ঘন করা না হয় তজ্জন্য বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইমারসন্ সাহেব অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার ও অপর নেতৃবর্গের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন যে, আগন্তুক প্রতিনিধিদিগকে নদীর পাড় হইতে অভ্যর্থনা করিয়া নিবার সময়ে রাজপথে শোভাযাত্রা কিংবা 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করা যাইতে পারিবে না। বলা বাহুল্য একান্ত ক্ষোভে ও দুঃখে নেতৃবর্গ এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৩ই এপ্রিল রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে নারায়ণগঞ্জ

এবং খুল্‌না এই দুই মেইল ষ্টীমারে নানাদিক দেশ হইতে বহু শত প্রতিনিধি বরিশাল নগরে উপস্থিত হন। প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি ব্যারিষ্টার রসুল সাহেব, তাঁহার পত্নী, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ, সঞ্জীবনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জিলার বহু প্রতিনিধি এবং এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এই সময়ে আসিয়াছিলেন। দুই ষ্টীমারের প্রতিনিধিগণ মহোল্লাসে বন্দেমাতরং ধ্বনি করিয়া নৈশ গগন ও নদীবক্ষঃ আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমারের ইঙ্গিতে নদীকূলে সমবেত বিরাট্ জনসঙ্ঘ উহার প্রতিধ্বনি না করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

ইহাতে দুঃখিত হইয়া উপস্থিত প্রতিনিধিগণের অনেকেই বলিলেন, আমরা তীরে অবতরণ করিয়াই রাজপথে বন্দেমাতরং ধ্বনি করিব। তখন অশ্বিনীকুমার এবং বরিশাল-নগরের অপর প্রতিনিধিগণ ষ্টীমারে গমন করিয়া জানাইলেন, অভ্যর্থনাকালে রাজপথে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি উচ্চারিত হইবে না, আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইয়াছি। তীরে নামিয়া আপনারা 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করিলে পুলিশ লাঠি চালাইতে পারে এবং উহাতে বহু অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। সুরেন্দ্রনাথ এই সমস্ত অবগত হইয়া প্রতিনিধি-দিগকে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি উচ্চারণে বিরত হইতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের এই ব্যবস্থায় এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় প্রাণে এমন বেদনা পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অভ্যর্থনাসভার আতিথ্যগ্রহণ না করিয়া অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। তাঁহারা সেই রাত্রে কেহই অন্নগ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রন্দন করিয়া নিশিযাপন করেন।

সেইদিন রাত্রিকালে রাজাবাহাদুরের হাবিলীতে এক বিরাট্ সভায় সভাপতি রসুল সাহেব এবং সমাগত প্রতিনিধিগণ মহা সমারোহে অভিনন্দিত হন। সভাস্থলে প্রায় দশ মিনিটকাল অবিশ্রান্ত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া সেই বিরাট্ জনসঙ্ঘ তাহাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এবং এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"রাজপথে বন্দেমাতরং উচ্চারণ-নিষেধ-মূলক আদেশ আইন-সঙ্গত নহে সুতরাং সেই আদেশ প্রতিপালন করা অন্যায়। রাজপথে বন্দেমাতরং উচ্চারণ করিতেই হইবে।" বস্তুতঃ প্রতিনিধিগণের অনেকেই উক্ত মত পোষণ করিতেন। এই জন্য সভার অধিবেশনদিনে অশ্বিনীকুমারপ্রমুখ বরিশালের নেতৃগণ সুরেন্দ্রনাথ ও অপর প্রতিনিধিদিগকে জানাইলেন—"ষ্টীমারঘাটে শোভাযাত্রা ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করা হইবে না, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমরা এই অঙ্গীকারেই আবদ্ধ ছিলাম।

উহা প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রতিনিধিগণ অভ্যর্থিত হইয়াছেন। এখন প্রাদেশিক সমিতি-সংশ্লিষ্ট কোন কার্য্যের জন্য অভ্যর্থনাসভা আর দায়ী নহেন। প্রতিনিধিগণ যদি বরিশালের রাজপথে বন্দেমাতরং ধ্বনি উচ্চারণ করা সঙ্গত মনে করেন, বাকরগঞ্জবাসিগণ উহাতে আনন্দসহকারে যোগদান করিবেন।" অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হয়, যে-আদেশ আইনসঙ্গত নহে তাহা প্রতিপালন করা অনাবশ্যক। বেলা দুই ঘটিকার সময়ে প্রতিনিধিগণ রাজাবাহাদুরের হাবিলীতে সমবেত হইবেন, সেখান হইতে সভাপতির অনুগমন করিয়া বন্দেমাতরং উচ্চারণ করিতে করিতে সকলে সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইবেন। প্রতিনিধিগণের এই সিদ্ধান্ত ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল—এই সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া পুলিশ পক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারপ্রমুখ নেতৃবর্গের নিকট এই প্রস্তাব প্রেরিত হইল—"আপনারা শোভাযাত্রা করিয়া সভাপতির অনুগমন করুন, কিন্তু বন্দেমাতরং ধ্বনি রাজপথে যেন করা না হয়।" নেতৃগণ ইহাতে অসম্মত হইলে আবার এই এক প্রস্তাব প্রেরিত হইল—"রাজাবাহাদুরের হাবিলী হইতে কলেজ পর্য্যন্ত নীরবে গমন করিয়া সেখান হইতে বন্দেমাতরং ধ্বনি করুন।" নেতৃগণ ইহাতেও সম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর যখন এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির পনরজন সভ্য দুই ঘটিকার সময়ে দলবদ্ধ হইয়া রাজাবাহাদুরের হাবিলীতে

প্রবেশ করিতেছিলেন তখন পুলিস সাহেব মিষ্টার কেম্প তাহাদের গতিরোধ করিয়া হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা সোসাইটির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিতে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিল। কৃষ্ণবাবু ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি উহাদিগকে হাবিলীতে প্রবেশ করিতে দেন। যথাসময়ে সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রতিনিধিগণ রাজাবাহাদুরের হাবিলী হইতে সভামণ্ডপে যাত্রা করিলেন। প্রথমে এক শকটে সপত্নীক সভাপতি মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত আব্দুল হালিম গজনভী সাহেব। তাঁহার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, কাব্যবিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব, অশ্বিনীকুমার, হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গজননীর কৃতী পুত্রগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে লাগিলেন।

যখন সভাপতি মহাশয়ের শকট লোন আফিসের প্রায় সমীপবর্ত্তী হইল এবং তাঁহার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ প্রায় একশত প্রতিনিধি নীরবে রাস্তার একপার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন তখন হাবিলী হইতে এন্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাজপথে বাহির হইলেন। যেমন তাঁহারা বাহির হইলেন অমনি অশ্বারোহী সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হেইনস্ সাহেব তাঁহাদের উপর অশ্ব চালাইয়া দিল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কেম্প সাহেব তাঁহাদের গমনে বাধা দিল এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর বক্ষ হইতে বন্দেমাতরং মন্ত্রাঙ্কিত উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল।

শচীন্দ্রপ্রসাদ হস্তদ্বারা বক্ষঃ আবৃত করিয়া উত্তরীয় রক্ষার চেষ্টা করিলেন। তখন কেম্প সাহেব শচীন্দ্রপ্রসাদকে ঘুসি মারিল। সাহেবের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুবেদার বাবুরাম সিং "শালা লোককো মারো হুকুম হুয়া" এই বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, অমনি কনষ্টেবলদিগের দীর্ঘ বংশযষ্টি প্রতিনিধি-গণের উপর পতিত হইল। পুলিশের অত্যাচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিনিধিগণ নীরব ছিলেন, কিন্তু যখন দেশভক্ত সন্তানের রক্তে ধরণী রঞ্জিত হইল তখন চতুর্দ্দিক হইতে ভীমনাদে বন্দেমাতরং ধ্বনি উত্থিত হইল। এন্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণের একজনও পলায়ন করেন নাই, তাঁহারা ভীষণ প্রহার খাইয়াও মহোৎসাহে মায়ের নাম করিতে লাগিলেন। আত্মরক্ষার জন্য যাহাদের হস্তে কিছুই ছিল না এমন মাতৃভক্ত সন্তানদিগকে পুলিশেরা নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা প্রহার করিতে করিতে কয়েক জনকে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বস্থ নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিল। সোসাইটির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতাকে কনেষ্টবলেরা প্রহার করিতে করিতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বের পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন যখন জল-মধ্যে দণ্ডায়মান তখনও পুলিশ তাহাকে প্রহার করিতেছিল। ঐ অবস্থায়ও চিত্তরঞ্জন ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বলিতেছেন—'বন্দেমাতরং'। চিত্তরঞ্জন এই নির্য্যাতন বর্ণনা করিয়া স্বয়ং বলিয়াছেন—"অবশেষে আমার শরীর অবশ হইয়া আসিল, আমি পৃথিবী

শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম, মনে হইল বুঝি আর মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে।” চিত্তরঞ্জন তাঁহার পিতা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—“বাবা, এই অবস্থায়ও পুলিশ আমাকে যতবার প্রহার করিয়াছে আমি ততবারই “বন্দেমাতরং” বলিয়াছি।” এইরূপ অবস্থায় এক কনেষ্টবল, চীৎকার করিয়া বলিল—“মৎমারো মর যায়ে গা,” প্রহার থামিল। এক কনেষ্টবল, চিত্তরঞ্জনকে হাত ধরিয়া উপরে তুলিল।

চিত্তরঞ্জনকে যখন পুলিশেরা প্রহার করিতেছিল তখন কলিকাতানিবাসী শ্রীযুত ললিতমোহন ঘোষাল চীৎকার করিয়া বলিলেন—”মনোরঞ্জন বাবুর ছেলেকে মারিয়া ফেলিল।” ব্যস্ত হইয়া অগ্রগামী প্রতিনিধিগণ পশ্চাতে ফিরিলেন। ওদিকে হাবিলীর ভিতরে যে সকল প্রতিনিধি ছিলেন তাহারা বাহির হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে অশ্বারোহী হেইন্‌স সাহেব তাঁহাদের উপর ঘোড়া চালাইয়া দিতে লাগিল। কনেষ্টবলেরা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাবিলীর ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেখানে নহবতের নিম্নে কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, পুলিশের লাঠিতে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। পুলিশ যখন ফটকের সম্মুখে লাঠি চালাইতেছিল তখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, কৃষ্ণনগরের শ্রীযুত বেচারাম লাহিড়ী, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় হাবিলী ও রাজপথের সংযোজক সেতুর উপর

আসিলেন। পুলিশ বেচারামবাবু ও রজনীবাবুকে প্রহার করিল। বেচারামবাবু অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইলেন। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে পুলিশ এমন সাংঘাতিকরূপে প্রহার করিল যে, তাঁহার মাথা ফাটিয়া গেল, তিনি ধরাশায়ী হইলেন। এই সময়ে কৃষ্ণকুমারবাবু স্নবেদার বাবুরাম সিংকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন এবং কেম্প সাহেবের হাত ধরিয়া টানিয়া আহত ব্রজেন্দ্রলালকে দেখাইলেন। কৃষ্ণকুমার বাবু বলিলেন—"তোমার পুলিশ গুণ্ডার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে, ইহাদিগকে থামাও, নতুবা আজ মহাবিপদ্ হইবে।" একটা কনেষ্টবলের গলা ধরিয়া কৃষ্ণকুমার বাবু বলিলেন, এই কনেষ্টবল হাবিলীর ফটকে গিয়া প্রতিনিধিদিগকে প্রহার করিয়াছে, আমি তাহা দেখিয়াছি। কেম্প সাহেব বলিল—ইহার নাম শ্রীশচন্দ্র দে, আমি ইহাকে গ্রেপ্তার করিলাম। পরক্ষণেই কনেষ্টবলটা দলে মিশিয়া গেল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কেম্প সাহেবকে বলিলেন, "এই কনেষ্টবলগুলি তোমার অধীন, ইহাদিগকে তুমি থামাও।" কেম্প সাহেব কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া বলিল—"আমার কর্ত্তব্য আমি জানি।" পুলিশ বহু প্রতিনিধিকে প্রহার করিল—কেহ কেহ গুরুতররূপে, অনেকে সামান্যরূপে আহত হইলেন। অবশেষে বিউগেল বাজিয়া উঠিল. অমনি পুলিশদল হাবিলীর সম্মুখস্থ রাস্তায় দণ্ডায়মান হইল।

যেস্থলে কৃষ্ণকুমার বাবু ও শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত কেম্প সাহেবের কথোপকথন হইতেছিল সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রবাবু পুলিশ সাহেবকে বলিলেন—"তোমার পুলিশ এই সকল লোককে প্রহার করিতেছে কেন? ইহারা কোন অন্যায় করেন নাই। তুমি যদি মনে কর উহারা অন্যায় করিয়াছেন, উহাদিগকে গ্রেপ্তার কর। আমি সকল দায়িত্ব নিজে লইতে প্রস্তুত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পার।" উত্তরে কেম্প সাহেব বলিল—"আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।" সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমি হাজির আছি।" তখন অমৃতবাজার পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" কেম্প সাহেব বলিল—"একমাত্র সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ আমি পাইয়াছি।" কেম্পসাহেব সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বাড়ী যাত্রা করিল। অশ্বিনীকুমার, জমিদার বিহারীলাল রায় এবং কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার অনুগমন করিলেন। কেম্পসাহেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইমারসনের গৃহমধ্যে লইয়া গেল, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বাড়ীর দ্বারদেশে শকটমধ্যে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক চাপরাশী আসিয়া অশ্বিনীকুমার ও বিহারীবাবুকে ম্যাজিষ্ট্রেটের বসিবার ঘরে লইয়া গেল। তাঁহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র ইমারসন্

সাহেব বরিশাল সহরের এই দুই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে চীৎকার করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"বাহির হও, তোমাদের মাথায় টুপী নাই।"—ধুতিচাদরপরা অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"ইহাই যে আমার জাতীয় পরিচ্ছদ।" বিহারীবাবুর টুপীটা হাতে ছিল, তিনি উহা দেখাইয়া বলিলেন—"এই ত আমার টুপী।" কিন্তু কে কার কথা শুনে? রুদ্রাবতার ইমারসন্ সাহেব ক্রমাগত বলিতেছিলেন—"বাহির হইয়া যাও।" তাঁহারা এইরূপে অপমানিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গী কাব্যবিশারদ মহাশয় একখানি পরদার আড়ালে বাহিরে ছিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল কাষায় বস্ত্র, গলে ছিল গৈরিক উত্তরীয়, দেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত। তাঁহাকে দেখিয়া ইমারসন্ সাহেব বিকট স্বরে—"বাহির হও, বাহির হও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিন জনেই লাঞ্ছিত হইয়া বাহিরে আসিলেন।

ইহার পরে বিচার প্রহসন চলিল। সুরেন্দ্রনাথ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৮৮ ধারার অপরাধী স্থিরীকৃত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে দুই শত টাকা জরিমানা করিলেন। বিচারাভিনয় শেষ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন—'This is disgraceful.' "ইহা লজ্জাজনক" সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"I protest such a remark, a remark of this kind ought not to come from the Court." অর্থাৎ "আমি আপনার এইরূপ

মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতেছি, বিচারাদালত হইতে এইরূপ মন্তব্য হওয়া উচিত নহে।" ইমারসন্ সাহেব ভীম গর্জ্জনে বলিলেন–"Keep quiet, this is contempt of Court, I draw up contempt proceedings against you." অর্থাৎ "চুপ কর, এতদ্দ্বারা আদালত অবজ্ঞা করা হইতেছে, আমি তোমার বিরুদ্ধে আদালত অবজ্ঞার মামলা রুজু করিতেছি।" উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"I have done nothing. Do just as you please." অর্থাৎ "আমি কোনরূপ অন্যায় করি নাই, আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" তৎক্ষণাৎ বিচার হইয়া গেল, সুরেন্দ্রনাথকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ইমারসন সাহেব দুই শত টাকা জরিমানা করিলেন। এই সময়ে ইমারসন্ সাহেবের এক সিবিলিয়ান বন্ধু অস্ফুটস্বরে তাহাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিলেন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্রুদ্ধ ইমারসন্ সাহেবের বুদ্ধির গোড়ায় তখন একটু জল আসিল। তিনি যেন একটু খানি নরম হইয়া বলিলেন—"I give you an opportunity to apologise". 'আমি আপনাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ দিলাম।' বুদ্ধিদাতাও বলিয়া উঠিলেন, "You ought to take this opportunity and apologise." "এই সুযোগ গ্রহণ কারয়া আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।" দৃঢ়চিত্ত সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "I respectfully decline to apologise. I have done nothing

wrong." "আমি ক্ষমা স্বীকার করিতে সবিনয়ে অস্বীকার করিতেছি। আমি কোন দোষ করি নাই।" বিচার-প্রহসন এইখানে শেষ হইল। সুরেন্দ্র বাবু পুলিশ সাহেবের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জরিমানার চারিশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সহজে ছাড়িয়া দিবার পাত্র নহেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করেন। সরকার হইতে ১৮৮ ধারার মামলা তুলিয়া লইয়া জরিমানার টাকা ফেরত দেওয়া হইয়াছিল। হাইকোর্ট প্রকাশ করেন—"We can not find any justification for the proceedings for the contempt of Court in the circumstances of the case" "এই মামলার ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা আদালত অবমাননার কোন প্রমাণ পাইতেছি না।" হাইকোর্ট ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুরেন্দ্রনাথকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটই অন্যায় করিয়াছেন। এই জন্য হাইকোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ বাতিল করিয়া জরিমানার টাকা ফেরত দিবার হুকুম দিয়াছিলেন।

যে সকল প্রতিনিধি পুলিশ-কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা বহুকষ্টে থানায় এজাহার লিখাইলেন। তারপর সরকারী ডাক্তার খানার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট লিখাইয়া লইলেন।

বন্দী সুরেন্দ্রনাথের সহিত অশ্বিনীকুমার, বিহারীলাল ও কাব্যবিশারদ মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটের ভবনে গমন করেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এদিকে পুলিশের প্রহার খাইয়াও প্রতিনিধিগণ রণজয়ী সৈন্যের মত মহোল্লাসে নির্ভয়ে 'বন্দেমাতরং' রবে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমার অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার লিখিত মুদ্রিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া প্রতিনিধিদিগকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

## অশ্বিনীকুমারের অভিভাষণ

"অভ্যর্থনাসভা এবং বাকরগঞ্জ জিলার পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। এতকাল পরে আমরা যে আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম এজন্য আমি বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছি। এই জিলার উপর দিয়া যে সমস্ত কঠোর অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, এই জিলা যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় নিরাশায় ডুবিয়া যায় সত্য, কিন্তু আবার এই কারণেই সমগ্র বঙ্গের অধিবাসিগণকে আমাদের আহ্বান করা কর্ত্তব্য, কেননা তাহাদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ অভিন্ন।"

"এই সমিতির অধিবেশন দেখিবার জন্য যিনি নিরতিশয় ব্যগ্র ছিলেন সেই স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয়ের মৃত্যুবেদনা আমরা অদ্য বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। স্বর্গীয় চৌধুরী আছমাতালীখাঁ সাহেব ও স্বর্গীয় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরীর মৃত্যুতেও আমরা শোকসন্তপ্ত। তাঁহারা জীবিত থাকিলে অভ্যর্থনা সভা নিঃসন্দেহ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইত।"

"অধুনা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণোপযোগী কিছুই বরিশালে নাই। তবে আপনারা যেস্থানে সমবেত হইয়াছেন এই স্থান ইতিহাসবিশ্রুত চন্দ্রদ্বীপ পরগণার অন্তর্গত। চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের বীরোচিত কার্য্যকলাপ সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু আজ আর তাহার কিছুই নাই। আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য আমরা যে অকিঞ্চিৎকর বন্দোবস্ত করিয়াছি তাহা দ্বারা পরিমাপ করিলে আমাদের সহৃদয়তার অভাব অনুভূত হইবে সত্য, কিন্তু সরলতা এবং আন্তরিকতা দ্বারা পরিমাপ করিলে নিশ্চিতই আমরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইব।

অদ্য বাকরগঞ্জের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় দিন। জননী জন্মভূমির নামে আজ বহুসংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তি এস্থানে সমবেত হইয়াছেন এবং একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই মহতী সভার সভাপতি হইবেন। মুসলমান ভ্রাতৃগণ শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন এরূপ আশা করি।

আমি বিশ্বাস করি যে, প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও এবার আমরা অতি সুসময়ে সমবেত হইয়াছি। কোটি কোটি সন্তানের সমবেত প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় বঙ্গ, বিশেষভাবে পূর্ব্ব বঙ্গ এই বিভাগের কুফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্গবিভাগ হইতে যে অবিশ্বাস ও অত্যাচার-মূলক শাসন নীতি প্রসূত হইয়াছে, তাহাতে রাজশক্তির প্রতি প্রকৃতিপুঞ্জের বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হইতেছে। এ সমস্তই নিরাশাব্যঞ্জক সত্য কিন্তু অমঙ্গল হইতে মঙ্গল প্রসূত হয়। এই সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়া যে নবজীবনের সূচনা হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর অশেষ কল্যাণ বিধান করিবে। মদগর্ব্বে যাহারা জাতি বিশেষের শুভাশুভকে ক্রীড়ার সামগ্রী করিতে চাহেন, আমাদের সমস্ত ব্যাপার যাহারা বিজাতীয় উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগের খেয়ালের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন, এতকাল পর্য্যন্ত আমরা স্বীয় নিয়তি বিস্মৃত হইয়া, তাঁহাদেরই হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। কিন্তু যিনি বঙ্গদেশ, অথবা কেবল বঙ্গদেশই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, বিংশশতাব্দীর সেই ভীষণ দাম্ভিক ব্যক্তির কঠোর আঘাতে অবশেষে আমাদের চৈতন্য হইয়াছে! জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ এই সুপ্ত জাতির উপর বর্ষিত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশ উদ্বোধিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ কেন, নিখিল ভারতবর্ষ শক্তিমান্ হইবে এবং অচিরেই আত্মশক্তি বলে স্বীয় নিয়তি স্থির করিয়া লইবে। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, উচ্চতর কার্য্যের জন্য ভগবান্ আমাদিগকে নিঃসন্দেহ নিযুক্ত করিবেন।

সময়ের গতি যিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের জন্মভূমির মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বলাভের সময় আগতপ্রায়। ব্রিটিশরাজত্বের অধীনে থাকিয়া ভারতবর্ষ যেদিন পৃথিবীর অপরাপর জাতির মধ্যে আসন লাভ করিবে সেদিন অদূরে। পূর্ব্বগৌরব এবং মহত্ত্বলাভের উপায় বিস্মৃত হইয়া যখন ভারতবর্ষ দিন দিন অধঃপতিত হইতেছিল, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ভারতবর্ষকে অপর একটি নবজাতির সংস্পর্শে আনিয়া দিয়াছেন। এই উদীয়মান জাতি আত্মশক্তি বলে বিভিন্ন দিকে অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছে এবং অধুনা সমগ্র পৃথিবীর প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। অধুনা-বিরল মহৎ লোকদিগের যত্ন ও চেষ্টায় এই উভয় জাতির এই সম্মিলন যে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের প্রতি আমাদের ভক্তি ও ভালবাসা কি জাগিয়া উঠে নাই? সমসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি শক্তিশালী জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কি আমাদের হৃদয়ে উদিত হয় নাই? যুগযুগান্তরের জড়তা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত কার্য্য

করিবার চেষ্টা করিতে কি আমরা আরম্ভ করি নাই? কুসংস্কার এবং মূর্খতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভারতজননীর নামে আমরা কি এদেশের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছি না? ভগবানের আশ্চর্য্য বিধান লক্ষ্য করুন—যাঁহার অনুপম প্রতিভা, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির বীজ বপন করিয়া গিয়াছে, যিনি নব্যভারতের পিতৃপদবাচ্য, সেই যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ-কারী মহৎ ব্যক্তিগণের কার্য্যাবলী, প্রাচীন ভারতের দৃষ্টান্তে পুনরায় মনুষ্যত্বলাভের শিক্ষা দিবার জন্য প্রতীচ্য জগৎ হইতে কর্ণেল অলকট্, মাডম ব্লাভাটাস্কি ও মিসেস এনি বেসাণ্টের আগমন, সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের মহৎ কার্য্য, আলিগড় মুসলমান কলেজ, ফারগুসন কলেজ; শিল্প ও বিজ্ঞানসমিতির স্বদেশ কল্যাণবিষয়ক কার্য্যকলাপ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির সমন্বয়কর জাতীয় মহাসমিতির রাজনৈতিক শিক্ষা, শিল্পবিজ্ঞান এবং সামাজিক সমিতিসমূহ কর্ত্তৃক যে সমস্ত মঙ্গল সাধিত হইতেছে তাহা, চিরস্মরণীয় ব্রাড্‌ল ও কেইনের কার্য্য; কংগ্রেসের স্থাপয়িতা মিঃ হিউম ও ভারতীয় পার্লামেণ্টারী কমিটির মাননীয় সভ্যগণের পরহিতপ্রণোদিত কার্য্য, সর্ব্বত্র অগ্নির ন্যায় যাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে সেই স্বদেশীভাব এবং ১৬ই অক্টোবরের বিরাট্ আন্দোলন এই সমস্ত এবং উদীয়মান জাপানের দৃষ্টান্ত

ভারতবাসীর সম্মুখে স্থাপন ভারতের পুনরুত্থানের জন্য বিশ্বপতির বিধান। সমগ্র দেশ নব চিন্তা, নব আদর্শ এবং নব আকাঙ্ক্ষায় উদ্বোধিত হইয়াছে! রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার অবিচারে এই নূতন স্রোত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইবে। সর্ব্বজাতির ভাগ্যবিধাতার ইঙ্গিতে যে স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, জগতের কোন শক্তিই সে স্রোতে বাধা দিতে পারিবে না বলিয়া আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।

এই সময়ে, এই জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে, উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য যুক্তবঙ্গের প্রতিনিধিগণ বরিশালে মিলিত হইয়াছেন এজন্য আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। আপনাদের সম্মুখে এখন জাতিগঠনের সমস্যা উপস্থিত।

আমার বিবেচনায় জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশজাত শিল্পের সৃষ্টি ও উন্নতি এবং সালিশী আদালত গঠন প্রভৃতি কার্য্য এই জাতীয় উন্নতির ভিত্তিভূমি হওয়া কর্ত্তব্য।

জাতীয় শিক্ষার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী হইতে আমরা বহু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শিক্ষা আমাদিগকে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া জাতীয় স্বার্থ চিন্তা করিতে উদ্বোধিত করিয়াছে। কোন জাতিই যে কেবল পরপদলেহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারেনা, তাহা এই শিক্ষাই আমাদের

হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। আমাদের অভাব এবং যে সমস্ত উদারনীতি বলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব হয় তাহাও এই শিক্ষাই আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু যতদিন এই সমস্ত নীতি আমরা আত্মশক্তিবলে জাতায় ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের অভ্যুত্থান দূরে থাকুক, আমাদের যাহা কিছু মনুষ্যত্ব আছে তাহাও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবনা। আমাদিগের আদর্শ এবং জীবনের উদ্দেশ্য প্রতীচ্য জাতি হইতে পৃথক্। যে-সমস্ত রীতিনীতি প্রাচ্য প্রকৃতি গঠন করে তাহা প্রতীচ্য রীতিনীতি হইতে পৃথক্। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী এই পার্থক্যের হিসাব করে না। আমাদের বালকগণ কি ভারতীয় চিন্তায় ও ইতিহাসে শিক্ষিত হয়? প্রাচীনকালের ঋষি এবং সাধুগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত অবিনশ্বর সত্যের উপাদানে গঠিত ভারতীয় জীবনের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করা আমাদের শিক্ষকগণের পক্ষে অসম্ভব। প্রাচীন উপাদান লইয়া নূতন জীবন গঠন করা এই সমস্ত শিক্ষকদিগের পক্ষে সম্ভব কিনা বলিতে পারি না। আত্মশক্তিবলে আমাদিগকে প্রতীচ্য জগৎ হইতে নূতন জ্ঞান আনিয়া তাহা প্রাচীনের সহিত মিশাইয়া ভারতভূমির প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক গৃহ ও প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত করিতে হইবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মহাজাতি সংগঠন করিবার জন্য মাতৃভূমির নামে সকলকে যুক্তভাবে কার্য্য করিতে আহ্বান

করিতে হইবে, এরূপ করিতে পারিলেই জাতীয় শিক্ষা ফলপ্রসূ হইবে। জাতিসংগঠনকারী কোন মহাজন বলিয়াছেন—"জাতীয় শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতিই নৈতিক উন্নতি করিতে পারে না, কেন না, একমাত্র জাতীয় শিক্ষার উপরই জাতীয় বিবেকবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।" এজন্যই দেশের সর্ব্বশ্রেণীর অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ সার্ব্বভৌমিক জাতীয় শিক্ষার উদ্যম আমরা আনন্দের সহিত আবাহন করিতেছি।

ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে এরূপ কোন জাতীয় উপায় উদ্ভাবন আমাদের সম্মুখে দ্বিতীয় সমস্যা। ভারতের যে ঐশ্বর্য্য এক সময়ে সমগ্র জগতের হিংসার বিষয় ছিল, ভারতবর্ষ-জাত যে দ্রব্যাদি এক কালে প্রাচ্য জগতের গৌরব ঘোষণা ও প্রতীচ্য জগতের অভাব পূরণ করিত, সেই ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ এখন অন্নবস্ত্রের চিন্তায় আকুল। ভারতীয় শিল্পের অধঃপতনের শোচনীয় বৃত্তান্ত সর্ব্বজন-বিদিত। প্রায় দুই কোটিগজ ম্যাঞ্চেষ্টার-জাত বস্ত্র প্রতি বৎসর ভারতবাসীর লজ্জা নিবারণ জন্য আমদানী হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের শস্যভাণ্ডার বলিয়া প্রসিদ্ধ এই বাকরগঞ্জে এক বৎসর দুর্ভিক্ষ হইলে অন্নের জন্য চিন্তিত হইতে হয়। যাহা হউক সমস্ত প্রদেশেই শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। তন্তুবায়গণ অতি অল্পকাল হইল তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায় পুনঃ গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা কিছুকাল

পূর্ব্বে·মাঞ্চেষ্টারের অত্যাচারে উৎপীড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল. বর্ত্তমানকালে তাহারা আশার আলোক-প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অচিরেই তাহাদের পরিশ্রমজাত বস্ত্র বিদেশী বস্ত্রের সমকক্ষতা লাভ করিবে এই আশায় উৎফুল্ল। বস্ত্রবয়নের যে সমস্ত কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সেইগুলি এবং ভারতবর্ষের এক কোটি দ্বাদশ লক্ষ তন্তুবায় কি এদেশের ত্রিশ কোটি অধিবাসীর প্রয়োজনীয় বস্ত্র যোগাইবার পক্ষে প্রচুর নহে? কিন্তু কেবল তন্তুবায় সম্প্রদায় কেন, সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে বয়ন ও রঞ্জন প্রভৃতি শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিতেছেন।

আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে এই সহরের অনেক ভদ্রলোক স্বীয় স্বীয় গৃহে বয়ন যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের পুরাঙ্গনাগণ আনন্দের সহিত বয়ন কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। শিল্পশিক্ষার চেষ্টা ভগবৎপ্রেরিত এবং আমি বিশ্বাস করি অচিরেই ইহাদ্বারা আমাদের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইবে। শিল্প ও বিজ্ঞানসমিতির মহৎ কার্য্য নিশ্চিতই এদেশে নবযুগ আনয়ন করিবে। যেরূপ উৎসাহ-সহকারে আমাদের যুবকগণ এই সমিতির কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা কর্ত্তব্য। যে উৎসাহ শত শত ব্যক্তিকে স্বপ্নাতীত কার্য্যকরী শক্তি প্রদান করিয়াছে তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। বাকরগঞ্জের ন্যায় একটি অনুন্নত জিলার ৬।৭ খানি

গ্রাম হইতে দুই মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা মূল্যের নিব প্রস্তুত করা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? ইহা কি স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতার পরিচায়ক নহে? এইতো মাত্র আরম্ভ। এই উদ্যম সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কি আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে? জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য, স্বদেশী আন্দোলনের শুভ সংবাদ দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য, আমাদের শিল্পের উন্নতিপথের অন্তরায়, রক্ষণশীলতা ও নিরুদ্যম পরিহার করিতে শিক্ষা দিবার জন্য, আদর্শ শিল্পবিদ্যালয়সমূহ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রথানুসারে মূলধন নিয়োজিত না করিয়া নানারূপ কলকারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা-কল্পে আমাদের দেশের ধনীদিগকে উদ্বোধিত করিবার জন্য এবং সর্ব্বোপরি বহু যৌথ কারবার স্থাপন কল্পে দেশের লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বহু প্রচারক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কেবল মাত্র এই সমস্ত উপায় দ্বারাই দেশীয় শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব।

ইহার পর সালিশী সভাস্থাপন বিষয়ে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এতদপেক্ষা জাতীয় আত্মশক্তি-প্রতিষ্ঠার উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে 'মোড়ল' বা পঞ্চায়েত সভা ছিল। এই পঞ্চায়েত সভা বা মোড়লগণ গ্রামবাসিগণের ছোটখাট বিবাদগুলি মীমাংসা করিয়া দিতেন এবং সমাজের এমন শাসন ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এরূপ মীমাংসা অবনত মস্তকে গ্রহণ

করিতে বাধ্য হইতেন। গ্রাম্যসমাজের সেই প্রাচীন শক্তি লোপ পায় নাই, কিন্তু সেদিন আর নাই। গ্রামবাসিগণের সমবেত শক্তি এখন অতীতের কাহিনী। যে আত্মশক্তি এই গ্রাম্য সমাজের মূল ভিত্তি ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আর গ্রামের কেহই অভিযোগ মীমাংসার জন্য স্বজনের উপর নির্ভর করে না। দুষ্টকর্ম্মকারিগণ এক্ষণে স্বচ্ছন্দে লজ্জাভয়হীন হইয়া গ্রামে বাস করে। পুরাতন বিদায় লইয়াছে, গ্রাম্য সমিতি লোপ পাইয়াছে। এখন লোকে জিদের বশবর্ত্তী হইয়া আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আইন আদালতের উৎপীড়নে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত অশুভ নিবারণ এবং জাতীয় শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া সেই প্রাচীন সালিশীবিচারপ্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তন কি আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে? ইহা আমাদিগকে আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল করিবে এবং ইহা ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইয়া শক্তিশালী জাতি গঠনের আর উপায় নাই। সালিশী আদালত গঠিত হইলে জাতীয় শক্তির বিকাশ হইবে। এজন্য আমি বলিতেছি যে, প্রত্যেক জিলায় সালিশী সভা গঠিত হউক। সমাজের বন্ধন এমন দৃঢ় হউক যে, তাহার বলে যাহাদের ইচ্ছা নাই তাহাদিগকেও এই সমস্ত সভার মীমাংসা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইবে। আপনারা শুনিয়া আনন্দিত

হইবেন যে, বাকরগঞ্জে ইতোমধ্যেই এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং গ্রাম্য লোকসমূহ সালিসীসভার সুফল বিশেষভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে বিশেষভাবে যে ব্যাপার আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে আমি এখন সেই বঙ্গবিভাগের কথা বলিব। এই ব্যাপারের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে ক্লেশকর। ভারতসচিব বলিয়াছেন যে, বঙ্গবিভাগের আন্দোলন হ্রাস হইয়াছে, এ 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'। ভগবান্ জানেন, আমরা কি কষ্ট পাইতেছি। আমি মিঃ জন মর্লিকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তিনি কি আশা করেন যে, এরূপ একটা ব্যাপারের কারণ বিদূরিত না হইলে সভ্য জগতের কুত্রাপিও আন্দোলন হ্রাস হইতে পারে? এরূপ ব্যাপারে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড বা আয়ার্লণ্ড কোন স্থানেই আন্দোলন হ্রাস হইত বলিয়া তিনি কি আশা করিতে পারেন? একদল আত্মম্ভরী ও অত্যাচারী ব্যক্তি একটা সমগ্র জাতির হৃদয়ে আঘাত করিয়া, তাহাদের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক এবং বাণিজ্যব্যবসায় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্বার্থে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া অবশেষে নির্লজ্জের ন্যায় জাতীয় প্রতিবাদকে অল্পসংখ্যক আন্দোলনকারীর তথাকথিত প্রতিবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। জগতের কোন স্থানের লোকই কি এই উপেক্ষা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিত, অপর যে-কোন জাতিই এরূপ অবস্থায় তুমুল গোলযোগ উপস্থিত করিত এবং

শাসনযন্ত্র পরিচালন অসম্ভব করিয়া তুলিত। শান্তক্লিষ্ট বঙ্গবাসীর ধৈর্য্য অপরিসীম। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালার এজ্ঞান আছে যে তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশ ভাগ করায় বঙ্গবাসীর যে ক্ষতি ও অপমান হইয়াছে তাহা বাঙ্গালী কখনও বিস্মৃত হইবে না। যে পর্য্যন্ত বিভক্ত বঙ্গ যুক্ত না হইবে সে পর্য্যন্ত এ বেদনা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাগরুক রহিবে। যে দিন লর্ড কর্জ্জনের তরবারি বঙ্গ-জননীর হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে সেই চিরস্মরণীয় ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বঙ্গবাসী কি ভগবানের নামে শপথ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করে নাই যে, বঙ্গবিভাগের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা রক্ষা করিতে বঙ্গবাসী যথাশক্তি চেষ্টা করিবে? সে প্রতিজ্ঞা কি এত শীঘ্র, ছয় মাস গত না হইতেই, বঙ্গবাসী বিস্মৃত হইয়াছে? তাহাদের পক্ষে কি এ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব? কখনই না। সময় এবং জাতীয় আত্মশক্তির বলে এই প্রতিজ্ঞা বৎসরের পর বৎসর দৃঢ়তর হইবে এবং পরবর্ত্তী বংশধরগণ বাঞ্ছিত দিন লাভের আশায় পূর্ব্ববর্ত্তিগণ অপেক্ষা, অধিকতর আগ্রহের সহিত কার্য্য করিয়া গৌরব অনুভব করিবে।

বঙ্গবিভাগ হেতু যে অসন্তুষ্টি ও ব্যস্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি হ্রাস হইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে? স্যর্ ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার তীব্র অত্যাচারমূলক শাসননীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে অত্যাচারিত ব্যক্তি ক্রমে

শান্তভাব ধারণ করিবে ইহা কি স্বাভাবিক? শোকাতুর ব্যক্তিকে কঠোর শাসন করিলে তাহার হৃদয়ের বেদনা দূর করিবার আশা করা যায় কি? কিন্তু স্যর ব্যাম্‌ফিল্ড এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। "কোন জাতিই আইনদ্বারা শাসিত হয় না, পাশবিক শক্তিদ্বারা ত নয়ই।" লাট্‌ ফুলার তাঁহার দেশবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ রাজ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিতকর্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতির এই প্রথম সূত্রই বিস্মৃত হইয়াছেন! যখন বঙ্গদেশ গভীর শোকাচ্ছন্ন তখন তিনি গুর্খা সৈন্য স্থাপন, পিউনিটিভ পুলিশ স্থাপন, স্পেশাল কনেষ্টবল সম্প্রদায় গঠন, প্রকাশ্যস্থানে পবিত্র "বন্দেমাতরম্‌" উচ্চারণ নিষেধ, ছাত্রদিগের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান নিষেধ, প্রকাশ্য স্থানে সভা নিষেধ প্রভৃতি আইন জারি করিলেন। যাহার ধমনীতে একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হয় সে কি এ অবস্থায় হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে? এ সমস্ত নীতির ফল কি হইয়াছে? বঙ্গবিভাগের ফলে এ সমস্ত হইতেছে বলিয়াই জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মিতেছে। এরূপ ধারণা অসন্তুষ্টির ভাব সংযত, না বৃদ্ধি করিবে? আমাদের দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য জগতে কেহ নাই, ভারতীয় প্রজার স্বার্থ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ উদাসীন, পার্লামেণ্টের ভারত-হিতৈষী সভ্যদিগকে ঐকান্তিক চেষ্টা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রমাগত প্রতিনিধি প্রেরিত সত্ত্বেও মিঃ হারবার্ট রবার্টস্‌, স্যর হেন্‌রী

কটন ও অপরাপর ভারতবন্ধুগণ পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের বিন্দুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না; এই বিশ্বাস পূর্ব্বোক্ত ধারণার সহিত মিলিত হইলে অসন্তুষ্টির ভাব বৃদ্ধি হয়, কি হ্রাস হয়?"

স্যর হেন্‌রী কটনের বক্তৃতার একস্থলে "বিহার" শব্দ শুনিয়া পার্লামেণ্টের কোন সভ্য ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পার্শ্বস্থ অপর একজন সভ্যকে বলিয়াছিলেন, "বিহারের কথা কি হইতেছে?" তদুত্তরে ঐ সভ্য বলিলেন "ভগবান্ জানেন কি বলিতেছে, চল আমরা তামাক খাবার ঘরে গিয়া এক গ্লাস মদ খাইয়া আসি!" ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এই দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব কে সহিতে পারে? বঙ্গদেশ মৃত নহে। এরূপ তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণার ভাব বঙ্গদেশ সহ্য করিবে না—করিতে পারে না। ফাঁকা আশার কথা বা ওজর আপত্তিতে আর বঙ্গবাসী ভুলিবে না। ন্যায় এবং বিধিসঙ্গত ভাবে বঙ্গবাসী আন্দোলন চালাইবে ও প্রাণপণে বিলাতী পণ্য বর্জ্জন করিবে এবং কিছুতেই নিরস্ত হইবে না। গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, জাতীয় অভ্যুত্থানের সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। সুকুমার-মতি বালকগণের প্রতি অত্যাচারেও বঙ্গবাসী ভীত হইবে না। ইমার্সনের গ্রন্থোল্লিখিত রজকিনীর ন্যায় বঙ্গবাসীর নীতিও এই—"যত অত্যাচার, তত সাহস—ইহাই উত্তম নীতি।" বিধি ও ন্যায় সঙ্গত আহবে বঙ্গবাসী জয়লাভ করিবে।"

উপসংহারে আমি আপনাদিগকে পুনরায় সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। আমি আশা করি যে, এই সভায় আপনাদের আলোচনার ফলে শত শত প্রচারক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইবেন এবং দেশের রাজনীতি, শিল্পবাণিজ্য, সমাজ-নীতি এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য জিলায় জিলায় স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে।

অতঃপর মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি-বরণ প্রসঙ্গে এমন এক অগ্নিময়ী বক্তৃতা করেন যে, তাহা শুনিয়া সভাস্থ সহস্র সহস্র ব্যক্তি ক্রোধে ও ক্ষোভে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। বক্তৃতা মধ্যে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন— এতদিন ইংরাজের আইন ও ন্যায় বিচারের প্রতি লোকসাধারণের অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু অদ্য যে ব্যাপার সংঘটিত হইল তাহা দেখিয়া ঐ ধারণা লোকের মন হইতে বিদূরিত হইল।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুলিখিত, সুচিন্তিত বক্তৃতায় বঙ্গব্যবচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ ও স্বদেশীর সমর্থন করিয়া এই আন্দোলনে মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সহিত মনোপ্রাণে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা এক জননী জন্মভূমির সন্তান এবং আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হিন্দুর সহিত অভিন্ন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ চীন, তুরস্ক ও জাঞ্জিবার দেশীয় মুসলমানদিগের স্বার্থ এক হইতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক অভিযানে

আমরা আমাদের স্বদেশীয় হিন্দু ও খৃষ্টানদের সহযাত্রী।"
সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাপাঠ শেষ হইলে—অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করেন—

যেহেতু অদ্য দিবালোকে সমস্ত সহরের লোকের সম্মুখে, পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট ও আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশে, সভাপতি রসুল সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত প্রতিনিধিগণের উপর পুলিশ যেরূপ লাঠি চালাইয়াছে এবং দেশের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিনা কারণে যেরূপে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বরিশাল জিলায় আইনসঙ্গত শাসন প্রণালী লুপ্ত হইয়াছে। অধিকন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের নানাস্থানে লোক স্বদেশসেবার জন্য প্রহৃত ও নানারূপে লাঞ্ছিত হইতেছে দেখিয়া এই সমিতি বিশ্বাস করেন যে, এদেশে আর বৈধ শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই। সুতরাং বর্ত্তমান দায়িত্বশূন্য গভর্ণমেণ্টের উপর যে সকল কার্য্যের ফলাফল নির্ভর করে, এই বর্ষের সমিতি তৎসমুদায়ের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া কেবল মাত্র দেশের লোকের আত্মশক্তির উপর যেসমস্ত কার্য্যের ফলাফল নির্ভর করে সেই সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা করিবে।

'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও হাওড়াহিতৈষী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় কাব্যতীর্থ

প্রভৃতি মহাশয়গণের সমর্থনে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের আলোচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথ সভামধ্যে প্রবেশ করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মুহুর্ম্মুহু বন্দেমাতরং ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলে, সহস্র সহস্র লোক আসন ত্যাগ করিয়া যাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হইল। প্রায় দশমিনিটকাল বন্দেমাতরং ধ্বনি উচ্চারিত হইবার পরে সভা যখন নিস্তব্ধ হইল তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অগ্নিময়ী বক্তৃতায় বিদেশজাত পণ্যদ্রব্য বর্জ্জনের জন্য মাতৃভূমির নামে সকলকে কঠোর প্রতিজ্ঞা করাইলেন।

তেরশত তের সালের প্রথম দিন বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় দিন। এইদিন বরিশালের রাজপথে বঙ্গের মাতৃভক্ত সন্তানগণ পুলিশের দীর্ঘ বংশদণ্ডের প্রহারে নির্য্যাতিত হন, এইদিন বঙ্গবাসীর রাজনৈতিক গুরু ও স্বদেশীর প্রবীণ পুরোহিত সুরেন্দ্রনাথ কেম্প ও ইমার্সন সাহেব কর্ত্তৃক অযথা লাঞ্ছিত হন এবং এইদিন ভূপেন্দ্রনাথ মতিলাল, ব্রহ্মবান্ধব, সুরেন্দ্রনাথ, মনোরঞ্জন প্রভৃতি বঙ্গজননীর প্রসিদ্ধ সন্তানগণের মর্ম্ম হইতে আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তির বাণী উত্থিত হইয়া বঙ্গের রাজনীতিক আন্দোলনকে নূতন আকার দান করে।

অশ্বিনীকুমার এই দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের ভবন হইতে স্বদেশী পরিচ্ছদ পরিধান করিবার অপরাধে বিতাড়িত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে কখনও বিদেশী পোষাক পরিধান করিবেন না। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা একদিনের জন্যও লঙ্ঘিত হয় নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি বহুদিন হইতে স্বাবলম্বন মন্ত্র প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, এই দিন হইতে আরও দৃঢ়তার সহিত উক্ত মন্ত্রকে বরণ করিয়া লইলেন। প্রাদেশিক সমিতির দ্বিতীয় দিনে সর্ব্বপ্রথমে এই প্রস্তাব করা হয় যে, যেখানে সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ঐস্থলে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হউক। অতঃপর যথাক্রমে বঙ্গব্যবচ্ছেদ, জাতীয়শিক্ষা, বিলাতী বর্জ্জন সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত, অনুমোদিত ও আলোচিত হয়। বিলাতী দ্রব্যবর্জ্জনের প্রস্তাবটি সভাপতি মহাশয় স্বয়ং উত্থাপন করেন। সুরেন্দ্রনাথ ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া উপসংহারে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন। সেই বিশাল জনসঙ্ঘ দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন—

"জগদীশ্বর ও জন্মভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা সাধ্যমত বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব। ভগবান্ আমাদের সহায় হউন।" সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে এক একটি শব্দ উচ্চারণ করেন, পরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ তাহা পুনরুচ্চারণ করেন। এইরূপে প্রতিজ্ঞার সমস্ত শব্দগুলি উচ্চারণ

করিয়া সকলে বন্দেমাতরং ধ্বনি করিয়া আসন গ্রহণ করেন।

সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতান্তে বিলাতী বর্জ্জন প্রসঙ্গে ডাক্তার আবুল হোসেন মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও কাব্যবিশারদ মহাশয় বক্তৃতা করেন। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বে কেম্প সাহেব, অপর এক শ্বেতাঙ্গ এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী সভাস্থলে উপস্থিত হন। কেম্প সাহেবকে দেখিয়া সভায় মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সে সুরেন্দ্রবাবুর নিকটে আসিয়া বলিল—"আশা করি, আপনার নিকটে থাকিলে আমি নিরাপদ্ থাকিব।" তখন কেম্প সাহেব বলিল—সভাভঙ্গের পর কেহ রাজপথে বন্দেমাতরং উচ্চারণ করিবেন না, নেতৃগণ এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে সভার কার্য্য চলিতে পারে, অন্যথা নহে।" কিন্তু কেহই ঐ প্রতিশ্রুতি দিলেন না। তখন কেম্প সাহেব বলিল—"তবে আপনারা সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া যান, নচেৎ আমি বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দিব।" এই কথায় প্রতিনিধিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এবং বরিশালের উকীল দীনবন্ধু সেন মহাশয় সভা ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টার শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় উহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কৃষ্ণকুমার বাবু বলিলেন—

"পুলিশ লাঠি বা বন্দুকের গুলি চালাইয়া সভাভঙ্গ করুক নচেৎ আমরা এস্থান ত্যাগ করিব না।" সভায় এই লইয়া আলোচনা চলিল। কেম্পসাহেব আবার বলিল—"আমি আপনাদিগকে সভাভঙ্গ করিয়া যাইতে বলিতেছি। দুই রকমে এই কাজ হইতে পারে। পুলিশের দ্বারা তাড়িত হওয়া বা নীরবে চলিয়া যাওয়া। আমি আশা করি, আপনারা নীরবে চলিয়া যাইবেন।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বলিলেন—"যাও, সকলে গৃহে যাও। গৃহে গৃহে সভা হউক, চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বলুক, সে আগুনে চিরদিনের মত বিলাতী জিনিষ দগ্ধ হউক।" রোষে ও ক্ষোভে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে সভা হইতে লইয়া আসিবার জন্য তাঁহার বন্ধুদিগকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি তখনও বলিতেছিলেন —"পুলিশ আমাকে লাঠি মারিয়া বা গুলি করিয়া তাড়াইয়া দিউক।" এইরূপে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির আরব্ধ কার্য্য অকালে শেষ হইল। এই সমিতি-সংশ্লিষ্ট কতগুলি মামলা আদালতে রুজু হইয়াছিল। অনাবশ্যক বোধে সেই প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইল।

## বরিশালে দুর্ভিক্ষ

স্বদেশীর সেই স্মরণীয় যুগে যখন বরিশালের সুনাম সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে বৎসর প্রাদেশিক সমিতির

অধিবেশনকালে বঙ্গের শত শত মাতৃভক্ত সন্তান বরিশালের রাজপথে পুলিশের লাঠি প্রহারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই বৎসরই অকস্মাৎ বাকরগঞ্জ জিলায় দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। অশ্বিনীকুমারের সম্মুখে অকস্মাৎ এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হইল। তিনি বরিশাল-জিলার জনমণ্ডলীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, সুতরাং তাঁহাকেই অন্নদানের ভার গ্রহণ করিতে হইল। তিনিই ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া রাজপথে বাহির হইলেন।

কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বরিশাল জনসাধারণ সভার সম্পাদকরূপে নিরন্ন বরিশাল জিলার জনমণ্ডলীর পক্ষ হইয়া আবেদন প্রচার করিলেন। তাঁহার সেই আবেদনে নিখিল ভারত আশ্চর্যরূপে সাড়া দিয়াছিল। অল্পদিনমধ্যে তিনি দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে আশী সহস্রেরও অধিক অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বিনীকুমার এই সময়ে তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর স্বদেশবান্ধব-সমিতি পরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আপনার সমগ্র শক্তি দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্যে নিয়োগ করিলেন।

প্রত্যহ নানাগ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে বহুসংখ্যক পত্র আসিত। তিনি স্বয়ং সেইগুলি পাঠ করিয়া কাহাকে কি প্রকার সাহায্য করিতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। চাউল, বস্ত্র, থলিয়া প্রভৃতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেন। কাহার দ্বারা কোথায় কি প্রকারে সাহায্য

প্রেরিত হইবে তাহাও লিখিয়া দিতেন। ফলতঃ অল্পসংখ্যক কর্ম্মী লইয়া দিবারাত্রি তাঁহাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হইত।

প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ছয় ঘটিকার সময়ে কার্য্য আরম্ভ করিতেন। ১২টার সময়ে উঠিয়া স্নান-আহার সমাধা করিয়া ২টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত আবার কার্য্য করিতেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর আবার রাত্রি ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত কার্য্য চলিত।

এইভাবে দুই চারি দিন নহে, সুদীর্ঘ ৬। মাস তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া অন্নক্লিষ্ট নরনারীর সেবা করিয়াছিলেন। সাধ্যাতিবিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার সুস্থ-বলিষ্ঠ দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বরিশালের দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইলে তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বোম্বাইর অদূরবর্ত্তী মাথেরণ নামক স্থানে গমন করেন।

বরিশাল জিলার নানাস্থলে দেড় শতেরও অধিক স্বদেশ-বান্ধবসমিতির শাখা ছিল। এই সমিতিগুলির দ্বারা দুর্ভিক্ষ কালে অশ্বিনীকুমার জিলার নানা অংশে ১৬০টি সাহায্য বিতরণ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায় ছয় সহস্র টাকার চাউল বিতরণ করিতেন। এমন ব্যূহবদ্ধ প্রণালীতে এই বৃহৎ ব্যাপার অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইত যে, অশ্বিনী কুমারের অসামান্য কার্য্যপ্রণালী দর্শনে ভগিনী নিবেদিতা বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়াছিলেন। তিনি বরিশালে গমন

করিয়া স্বচক্ষে কয়েকটি সাহায্য বিতরণ-কেন্দ্রের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বরিশালের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি তখন মডারন্ রিভিউ পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাতে লিখিত হইয়াছে—"সরকারী সাহায্য ব্যতীত এই দেশে যে-সকল প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় লোকসেবায় নিযুক্ত আছে, সেই সকলের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানই বরিশালের এই দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতির মত এমন দ্রুত গঠিত হয় নাই, কোন সমিতিই নেতার প্রতি এমন অনুরাগ দেখাইতে পারে নাই, কোন সমিতিই এমন সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয় নাই। বস্তুতঃ কোন দেশেই এমন সমিতি ইতঃপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। আমার মনে হয় বঙ্গদেশে কেহ কখন এমন মহৎ অনুষ্ঠান করে নাই। বাকরগঞ্জে ছাত্রদের সাহায্যে এক স্কুলমাষ্টার এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছেন—বস্তুতঃ স্কুল-মাষ্টারই অশ্বিনীকুমারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। লোকসাধারণকে অন্নদান করাই সকল রাজনীতির চরম লক্ষ্য। অশ্বিনীকুমার এই আন্দোলনে সাফল্য লাভ করিয়া উহাই প্রমাণিত করিলেন।"

১৯০৬ অব্দের ১১ই জুন অশ্বিনীকুমার সাহায্য বিতরণ কার্য্য আরম্ভ করেন। কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৬০টি। প্রতি কেন্দ্র ৬ হইতে ১২টি গ্রাম লইয়া গঠিত হইয়াছিল। সাহায্য সমিতি মোট ৩১,১৬২ টাকা, ৫,৭৬৬ মণ চাউল ও ৩৫১০ জোড়া কাপড় মোট ৪,৮০,৩০১ ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ

করিয়াছিলেন। সাহায্যসমিতির কার্য্য ১৯০৬ অব্দের ২২এ ডিসেম্বর বন্ধ করা হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রথম যৌবন হইতেই সর্ব্বপ্রকারে বরিশালজিলাবাসী জনমণ্ডলীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কেবল মধুর বাক্যের দ্বারা নহে, সেবা ও প্রেমের দ্বারাই তিনি লোকের 'আপন জন' হইয়াছিলেন। প্রেমিক অশ্বিনীকুমার তাঁহার বাড়ীর "গোপাল" মেথরকে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার জন্য আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তিনি বিসূচিকা রোগাক্রান্ত এক মুসলমান রোগীকে অসহায় ও মুমূর্ষু অবস্থায় রাজপথ হইতে নিজের পৃষ্ঠে করিয়া চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। লোকসেবার জন্য আমরণ তাঁহার বুকে এমনই অফুরন্ত প্রেম ছিল। এই প্রেমের দ্বারা তিনি বরিশাল জিলার নিরন্ন নরনারীর সেবা করিয়াছিলেন। সাহায্য বিতরণ কালে তিনি দিবারাত্রি কর্ম্মব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যেও অনাহারক্লিষ্টা দুঃখিনীদিগকে সান্ত্বনাসূচক বাণী শুনাইবার মত সময়ের অভাব তাঁহার হইত না। এই সময়ে তিনি সত্য সত্যই দীনদুঃখীর মা-বাপ হইয়া তাহাদিগকে পালন করিয়াছেন। যাহারা রাজকীয় আইন অমান্য করিয়া দস্যুবৃত্তি করে তাহারাও এই রাজ্যহীন রাজার নামে মাথা নত করিত। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে এক ঘটনায় মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের অসামান্য প্রভাব নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল—

বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে এখনও মাঝে মাঝে জলদস্যুর উৎপাত হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের সময়ে ডাক্তার নিশিকান্ত বসু ঐ অঞ্চলের একগ্রামে চাউল বিতরণের জন্য গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি যে স্থানে আসিলেন ঐ স্থানে চোর ডাকাতের ভয় ছিল। মাঝিরাও ভীত হইয়া পড়িল। অন্ধকার হইবার পরে নৌকার কাছে দুই একটি করিয়া লোক জমিতে আরম্ভ হইল। ইহাদের মনের ভাব বুঝিতে নিশিবাবুর বিলম্ব হইল না। অশ্বিনীবাবুকে লোকে কি চক্ষে দেখে, কিরূপ মানিয়া থাকে তাহা তিনি জানিতেন। উহা স্মরণ করিয়া তিনি নৌকার বাহিরে আসিয়া সমবেত লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তোমরা জান এই নৌকা কাঁর? ডাকাতেরা প্রশ্ন করিল—কাঁর? নিশিবাবু বলিলেন—"এ বাবুর নৌকা, তিনি তোমাদের ঐ গ্রামটায় বিলাইবার জন্য চাউল পাঠাইয়াছেন। আমার সঙ্গে তেমন লোকজন নাই বলিয়া এতক্ষণ চাউল উঠাইতে পারি নাই, ভাই, তোমরা আসায় বড়ই ভাল হইয়াছে, এই চাউলের বস্তাগুলি গ্রামে পঁহুছাইয়া দিয়া আইস।" বরিশালের মুকুটহীন রাজার নাম শুনিবামাত্র যাহারা ডাকাতি করিবার মতলবে আসিয়াছিল তাহারাই বিনা পয়সায় মজুরের কাজ করিয়া যথাস্থানে চাউল পঁহুছাইয়া দিল। কেবল তাহা নহে, দস্যুদের এক ব্যক্তি নিশিবাবুর কাছে তাহাদের কুমতলব ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। সে

বলিয়াছিল, আপনি সময়মত বাবুর নাম না করিলে আমরা বড়ই কুকাজ করিয়া ফেলিতাম।

সত্যনিষ্ঠ পরোপকারী অশ্বিনীকুমার চিরদিনই বরিশাল জিলাবাসীদের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র ছিলেন। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি যখন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোককে অন্নদান করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, তখন তিনি সমগ্রজিলার নরনারীর হৃদয়মন্দিরে দেবতার আসন প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—

"যিনি বরিশালবাসী সকলের খবর রাখেন, সকল অভাব অভিযোগ দূর করেন, দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন আইসে যাহার নিকট হইতে, কলেরার সময়ে চিকিৎসক পাঠান যিনি, প্রেমে গদগদ হইয়া গোপাল মেথরকেও কোল দেন যিনি সেই অশ্বিনীকুমারকে ত বরিশালবাসী দেবতা জ্ঞান করিবেই। নূতন গাছের প্রথম ফলটি তাই বরিশাল জিলার গৃহস্থ সুফলের আশায় অশ্বিনীকুমার দত্তের নামে মানত করিত। যে ব্যাপারীর জ্বালের গুড় কেবল পুড়িয়া যায় সে-ও প্রথম জ্বালের গুড়খানা বাবুর নামে রাখিয়া দিত। আমি নিজে জানি, মৃত্যুশয্যাশায়ী পুত্রের জননী আকুল হইয়া অনুনয় করিয়াছেন—ওরে অশ্বিনীকুমারকে আনিয়া দে, তাঁহার পায়ের ধূলা পাইলেই বাছা আমার আরাম হইবে। আরও জানি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত বরিশালে প্রবাসী এক সরল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ নির্ব্বাসিত অশ্বিনীকুমারের মুক্তির জন্য

অশ্বিনীকুমারেরই নামে পুরীতরকারীর ভোগ মানত করিয়াছিল।”

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্য বিতরণ কার্য্যে অশ্বিনীকুমারের অনুরাগী কর্ম্মিগণ যে কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যাহারা কখন কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য করেন নাই এমন ভদ্রসন্তানগণ পল্লীগ্রামে বর্ষার কর্দ্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিয়া এক মাইল, দুই মাইল দূরে চাউলের বস্তা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। যে-সকল ভদ্রব্যক্তি লোকলজ্জাভয়ে কেন্দ্রে আসিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতেন না, যুবকগণ রাত্রিকালে তাহাদের ঘরে ঘরে চাউল দিয়া আসিতেন। এক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, এক দলপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কর্ম্মিগণ পরমোৎসাহে কার্য্য করিয়া এই মহাযজ্ঞের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

## কয়েকটি সভার কথা

১৯০৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে মহাসভার অধিবেশন হয় ঐ সভায় অশ্বিনীকুমার অভ্যর্থনাসমিতির সভ্য ছিলেন। নৌরজী মহাশয়ের অভিভাষণে এই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে ‘স্বরাজ’ শব্দের ব্যবহার হইয়াছিল। এই মহাসভায় জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনপ্রণালী লইয়া সভ্যগণের মধ্যে অত্যুগ্র মতবিরোধ ঘটে। মহাসভার

সভ্যগণ তখন মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন।

অশ্বিনীকুমারের রাজনীতিক মত চরমপন্থীদের তুল্যই ছিল কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি এই দুই দলের কোন দলের সহিতই যোগ রক্ষা করিতেন না। তিনি জাতীয় মহাসমিতিকে মানিয়া নিজের মতানুসারে কার্য্য করিতেন।

স্বদেশীর যুগে যখন কলিকাতা নগরে 'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্ত্তিত হয় তখন অশ্বিনীকুমার ঐ সভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

সুরাট্ কংগ্রেসে চরমপন্থীরা সভাপতি পদে বরণ জন্য অশ্বিনীকুমারের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে অশ্বিনীকুমার উহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

স্বদেশী যুগে অশ্বিনীকুমার একবার কলিকাতার দলাদলি মিটাইবার জন্য তথায় আহূত হইয়াছিলেন। সে আহ্বানে তিনি সাড়া প্রদান করেন নাই। বন্ধুদের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন—কলিকাতায় একটা আছে "সৌর" দল, আর একটা "বৈপিন" দল, আবার আমি কি সেখানে একটা "আশ্বিন" দল গঠন করিব?

বরিশালে এক মহতী সভায় অশ্বিনীকুমার বলিয়াছিলেন—"আজ যদি কর্ত্তা (পরমেশ্বর) এসে বলেন, অশ্বিনী মুক্তি নাও, তা'হলে আমি বলি, না, কর্ত্তা আর একটু সবুর কর। আর একবার এই বরিশালের মাটীতে শিশু হয়ে ভূমিষ্ঠ হই,

যৌবনে সকলের সেবা করি, বৃদ্ধ হয়ে সকলের চোখের জলের মধ্যে অন্তর্হিত হই।"

## অশ্বিনীকুমারের নির্ব্বাসন

১৯০৮ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসিত হন। অশ্বিনীকুমার কেন নির্ব্বাসিত হইলেন? এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব। যে আইনের দ্বারা কাহাকেও দণ্ড দিলে কোন প্রকার বিচার বা জবাবদিহি করিতে হয় না, গভর্ণমেণ্ট সেই ১৮১৮ অব্দের ৩ আইনদ্বারা অশ্বিনীকুমারকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন, স্বদেশী যুগে বরিশাল জিলায় অশ্বিনীকুমারের প্রভাব উক্ত জিলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রভাবকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছিল, এই কারণেই হয়ত তিনি রাজরোষে পতিত হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়া থাকিবেন।

আর একটি বিষয় সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, রিজলীর সার্কুলার লইয়া বরিশালে হুলস্থূল কাণ্ড ঘটিয়াছিল। এই সার্কুলারে ব্যক্ত হইয়াছিল—"ছাত্রেরা রাজনৈতিক কার্য্যে যোগ দিতে, বক্তৃতা করিতে, রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে পারিবে না।" ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিধি পূরাপূরি মানিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন—ছাত্রেরা রাজনীতিক বক্তৃতা করে, স্বাধীনভাবে রাজনীতিক কার্য্যে মাতিয়া যায়, ইহা আমরা ইচ্ছা করি না। কিন্তু কলেজের এবং স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মুখে

জন্মভূমির কথা শুনিয়া কেন জন্মভূমিকে ভালবাসিতে শিখিবে না, ছাত্রেরা উপযুক্ত নেতার অধীনে কেন স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিবে না, আমরা তাহার কারণ বুঝিতে পারি না।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ রাজনীতিক বক্তৃতা করিত না, কিন্তু কলেজ এবং স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ সভায় যোগ দিত, ভলান্টিয়ারের কার্য্য করিত। গভর্ণমেণ্টের আদেশ এই ভাবে লঙ্ঘিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়টির প্রতি রুষ্ট হইলেন। গভর্ণমেণ্টের আদেশে সরকারী বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্রদের বৃত্তি বন্ধ হইল।

এই সামান্য দণ্ডদান করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণ-মেণ্টের তৃপ্তি হইল না। উক্ত গভর্ণমেণ্ট হইতে এক গোপনীয় পত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ অনুবোধ প্রেরিত হইল—

"অশ্বিনীকুমার, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র দাস, রামচন্দ্র সেনগুপ্ত যদি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য্য হইতে বরখাস্ত না হন তাহা হইলে উক্ত বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী (Affiliation) তুলিয়া লওয়া হউক।"

অশ্বিনীকুমার তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হউন, নূতন বঙ্গের নূতন গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়-সমীপে অসঙ্কোচে এই প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে তখন মহাতেজস্বী স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন। তিনি বলিলেন, এইরূপ এক গোপনীয় পত্রের উপর নির্ভর করিয়া বহুকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ একটি বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী তুলিয়া লওয়া যায় না। তাহা করিতে হইলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আছে সেই সমস্তের প্রকাশ্য বিচার করা চাই। গভর্ণমেণ্ট উহাতে রাজি হইলেন।

তখন তদন্ত আরম্ভ হইল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের এবং পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট সেই সকলের কৈফিয়ত তলপ করা হইল। বিদ্যালয়কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষকদের প্রতি আরোপিত সকল অভিযোগ খণ্ডন করিলেন। বিদ্যালয়ের এক ছাত্র বক্তৃতা করিয়াছিল উহা স্বীকার করিয়া তৎসঙ্গে জানান হইয়াছিল যে, ছাত্রটি বি, এ, পরীক্ষা দিবার পরে বক্তৃতা করিয়াছিল। ঐ সময়ে তাহাকে ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র না বলিলেও বলা যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপারটি লইয়া মহা ফাঁপড়ে পড়িলেন। পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট বলেন, ব্রজমোহন বিদ্যালয় দোষী। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, "আমরা কোন দোষ করি নাই, একেবারেই নিরপরাধ।" এই অবস্থায় স্থানীয় তদন্তের প্রয়োজন হইল। আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, এই তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইবার পরিদর্শক প্রেরিত

হইয়াছিলেন। পরিদর্শকগণ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া কোন অপরাধ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, বরং কোন কোন পরিদর্শক বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রশংসা করিলেন।

গভর্ণমেন্ট ব্রজমোহন বিদ্যালয় তুলিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকিবেন কিন্তু তাঁহাদের সে আশায় বাদ সাধিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অতঃপর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রাণ অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত তুল্য সহকারী সুযোগ্য অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাসিত হইলেন। অশ্বিনীকুমার যে বিনাদোষে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন দেশের লোক তাহা তখনও মনে করিতেন এখনও মনে করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের টাইমস্ পত্রিকার মিঃ চিরলের (স্যর ভ্যালেণ্টাইন চিরল) মত স্বেচ্ছাতন্ত্রীও লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের যে সকল ব্যক্তিকে ১৮১৮ অব্দের তিন আইন মতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুই একজনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগই নাই। কেহ কেহ বলেন, অশ্বিনীকুমারের যে ডায়েরী চুরি গিয়াছিল, উহা হয়ত পুলিশের হাতে পড়িয়া থাকিবে এবং সুচতুর পুলিশ হয়ত উহার মধ্যে কোন অপরাধ আবিষ্কার করিয়া থাকিবে। ইহাও শুনা গিয়াছিল, অশ্বিনীকুমার নাকি কোন এক গুর্খা সৈনিকের রাজভক্তি বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই নাকি অশ্বিনীকুমারের বিরুদ্ধে প্রকৃত অভিযোগ। অশ্বিনীকুমারের মত ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির

পক্ষে এইরূপ নীতি-বিগর্হিত কার্য্য কত দূর অসম্ভব তাহা যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আবার অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ হইতে স্বদেশবান্ধবসমিতির কাগজপত্র চুরি গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, সেই চুরির সহিত অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্রের নির্ব্বাসনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে। এই সকল অনুমানের মধ্যে কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা তাহা কেবল গভর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন। যতপ্রকারের কথা উঠিয়াছিল আমরা সেই সকলের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

স্বদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, কারাদণ্ডকে তাঁহারা ভয় করেন না। নির্ব্বাসন দণ্ড অশ্বিনীকুমারের আন্তরিক স্বদেশসেবার গৌরবময় পুরস্কার। অশ্বিনীকুমার বরিশালে যেপ্রকার আন্দোলন চালাইতেছিলেন তাহাতে তাঁহাকে এইরূপ দণ্ড পাইতে হইবে তাহা তিনি জানিতেন। এই জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। নির্ব্বাসনের দিনদুই পূর্ব্বে তিনি এই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার নামে নির্ব্বাসনের পরোয়ানা আসিতেছে।

সে দিন রবিবার, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯০৮, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক ও ছাত্র জগদীশবাবুর আশ্রমে ধর্ম্মসভায় গিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র সেই সভায় নিবিষ্ট মনে হরিনামামৃত পানে মাতোয়ারা ছিলেন তখন এই সংবাদ আসিল, সশস্ত্র পুলিশ অশ্বিনীবাবুর বাড়ী

ঘেরাও করিয়াছে। খবর পাইয়া অশ্বিনীকুমার উঠিলেন, তাঁহার পেছনে পেছনে সতীশচন্দ্রও চলিলেন। ইহারা অধ্যাপক কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ীর মধ্য দিয়া মাঠ অতিক্রম করিয়া সোজা পথে আসিয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা লোক মুখে শুনিলেন, সতীশচন্দ্রের বাড়ীও সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করিয়াছে। তখন দুইজনে স্ব-স্ব গৃহাভিমুখে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবা মাত্র এক শ্বেতাঙ্গ (কোটস্ সাহেব) গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমাকে অতি অপ্রিয় সত্য বলিতে হইবে, আপনি এখন বন্দী।" অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"আমি কি অপরাধে বন্দী হইলাম, আপনি দয়া করিয়া তাহা বলিবেন কি?" সাহেব বলিলেন—"আপনি ১৮১৮ অব্দের ৩ আইন অনুসারে ধৃত হইয়াছেন।" অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"তাহা হইলে আমি নির্ব্বাসিত হইয়াছি। আচ্ছা, আমাকে কি প্রস্তুত হইবার জন্য কতক সময় দিবেন?" সাহেব উত্তর করিলেন—'হাঁ, আপনি প্রস্তুত হউন।' গৃহমধ্যে মহিলারা কাঁদিয়া উঠিলেন। অশ্বিনীকুমার স্নানাহার সমাধা করিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া লইলেন। সঙ্গে লইলেন—তাঁহার প্রাণপ্রিয় পুস্তকগুলি, খুব বড় অক্ষরে ছাপা একখানি শ্রীমদ্‌ভাগবত লইলেন। একবার ভিতরের কক্ষের দিক মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—

"লালা লাজপত রায়ের যাহা হইয়াছিল, এ তাহাই।" তখন অশ্বিনীকুমার অবিচলিত কণ্ঠে—"দুর্গা দুর্গা" বলিতে বলিতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তাঁহার পরমপ্রিয় বরিশালনগরবাসী সহস্র সহস্র ব্যক্তির হৃদয়গলা অশ্রু-অর্ঘ্যে অভিনন্দিত হইয়া অশ্বিনীকুমার শকটে আরোহণ করিলেন। যাঁহার মনে ভ্রমেও বিপ্লব-বিদ্রোহ স্থান পাইত না সেই শান্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের শকট তখন সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরি-বেষ্টিত হইল। অশ্বিনীকুমারকে লইয়া সাহেবেরা যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, ঠিক এমন সময়ে অকস্মাৎ কোথা হইতে এক পাগল সেখানে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হস্তস্থিত নর-কপাল দেখাইয়া বলিল, "পরমেশ্বর এত অধর্ম্ম বেশী দিন সহ্য করিবেন না, দুই দিন পরে যাহা হইবে তাহা এই দেখিয়া লও।"

অযোধ্যাবাসীকে কাঁদাইয়া রাম যেমন বনবাসে গিয়াছিলেন, বৃন্দাবন শোকের আঁধারে আবৃত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র যেমন গোকুলে গিয়াছিলেন, সেইরূপ বরিশালবাসীর নয়নের আনন্দ, প্রিয়তম নেতা অশ্বিনীকুমার সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নির্ব্বাসনে যাইতেছেন। যাত্রাকালে জনসঙ্ঘ অকস্মাৎ এমন তুমুলস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল যে, সেই শব্দে অশ্ব ভীত হইয়া নিশ্চল হইল। তারপর প্রহরি-

বেষ্টিত অশ্বযান ছুটিয়া চলিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বিপুল জনতা ষ্টীমারঘাটের দিকে দৌড়িয়া চলিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠে মুহুর্ম্মুহু উন্মত্তবৎ বন্দেমাতরং ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সেই ধ্বনি যেন সমগ্র নগরবাসীর নিরুদ্ধ বক্ষের আকুল ক্রন্দনের মত অনন্ত গগন আলোড়িত করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে অশ্বিনীকুমার নদীতীরে আসিয়া বরিশাল নগরের পবিত্র ধূলিদ্বারা ললাট ভূষিত করিয়া জিনিষপত্রসহ জাহাজে উঠিলেন।

এদিকে অশ্বিনীকুমারের সুদক্ষ সহকারী সতীশচন্দ্রও পরিজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছেন, তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন—"পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া শান্ত হইয়া থাকিও" ভগিনীকে বলিয়াছিলেন—"দুঃখ করিও না—এই ব্রতের এই কথা।"

দেশসেবার শ্রেষ্ঠ ফল অর্জ্জন করিয়া অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্নেহাস্পদ সহকর্ম্মীর সহিত নির্ব্বাসনে চলিলেন। জাহাজে অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে স্থান পাইয়াছিলেন। জাহাজখানি যখন চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন অপর একখানি জাহাজ উহার সমীপবর্ত্তী হইল। ঐ জাহাজে ঢাকার অনুশীলনসমিতির নেতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস এবং তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী বারদি-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র নাগ মহাশয় ৩ আইনের পরোয়ানায় ধৃত হইয়া আনীত হইয়াছিলেন। তখন দুই জাহাজ এক সঙ্গে কলিকাতার

অভিমুখে চলিতে লাগিল। ঠিক এই সময়েই 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, 'নবশক্তি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, বর্ত্তমানে 'সারভেণ্ট' পত্রিকার সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী এবং দেশবাসীর হৃদয়ের রাজা দানবীর সুবোধচন্দ্র মল্লিক এই পাঁচ জন স্বদেশসেবকও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র যে জাহাজে ছিলেন ঐ জাহাজ বুধবার কলিকাতার সমীপস্থ শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের নিকটে উপস্থিত হয়। শুক্রবার অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ নগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যখন যাত্রার সময় হইল তখন কোটস্ সাহেব অশ্বিনীকুমারকে বলিলেন—"অশ্বিনীবাবু, আপনি সতীশবাবুর পিতার তুল্য, বিদায়কালে যদি তাঁহাকে আপনি কোন হিতোপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন ত আমার সম্মুখে বলিতে পারেন।" অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"সতীশকে আমি আর কি উপদেশ দিব, সতীশ সমস্তই জানে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমার যে কথাটি মনে জাগিতেছে তাহা ম্যাডাম গেঁয়োর উক্তি—

"I pity my enemies, for these do not know, that iron-bars can not shut out my beloved."

ঐ দিনই সতীশবাবু রেঙ্গুনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে বেসিন সহরের কারাগারে তিনি নির্ব্বাসনকাল যাপন করেন।

অশ্বিনীকুমার যে দিন নির্ব্বাসিত হন সেই দিন বরিশাল সহরে যে, কি ভীষণ দুঃখ ও নৈরাশ্যের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহা বাক্যে প্রকাশ করিব কি প্রকারে? সে দিন নগরবাসী অধিকাংশ ব্যক্তি অনাহারে দিন যাপন করিয়াছেন। কেহ মনের দুঃখে শয্যাশায়ী হইলেন, কেহ কেহ হতবুদ্ধির মত নদীতীরেই বসিয়া রহিলেন। এই শোকে এক হিন্দুস্থানী মিঠাইওয়ালা দুই দিন উপবাস করিয়াছিল! এক মুসলমান অশ্বিনীকুমারের মুক্তিকামনায় রোজার সময়ে ১০ দিন অতিরিক্ত রোজা করিয়াছিল। অশ্বিনীকুমার চৌদ্দ মাস নির্ব্বাসনে ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ ঐ চৌদ্দ মাসের প্রত্যেক দিন নারায়ণকে ১০৮টি তুলসী দিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার যখন নির্ব্বাসিত হইলেন তখনই গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সুগঠিত স্বদেশবান্ধবসমিতিগুলিকে বে-আইনী সমিতি বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার কারাগারে দুঃসহ নির্জ্জনতা বা নৈরাশ্য অনুভব করিয়াছেন এমন কথা তাঁহার মুখে কদাচ শুনি নাই। নির্ব্বাসনকাহিনী লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"কি লিখিব? লিখিবার মত ত তেমন কিছু হয় নাই, sorrow and solitude কিছুই ত আমি অনুভব করি নাই।" কৌতুকী অশ্বিনীকুমার পরিহাসচ্ছলে বলিতেন—"একবার ছোট লাট বেলি বৃষ্টির সময়ে আমার মাথায় ছাতা ধরিয়াছিলেন, নির্ব্বাসনের সময়ে চামরের হাওয়া

খাইয়াছি। লক্ষ্ণৌ কারাগারের কয়েদীরা মনে করিত আমি কোন রাজা, মহারাজা হইব, আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ নিতে ছোট লাট হিউয়েট সাহেবও জেলে আসিয়াছিলেন। ছত্র চামর, উপাধি সমস্তই হইল, বাকী কেবল দণ্ড, কেন, দীর্ঘ-নির্ব্বাসনই ত আমার রাজদণ্ড।"

এই নির্ব্বাসন-কালেও অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্বভাব-সুলভ রসিকতা হারাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। লক্ষ্ণৌর ম্যাজিষ্ট্রেট্ একদিন অশ্বিনীকুমারকে অনুরোধ করিলেন—"আপনি এই যে ঘরটিতে থাকেন ইহার প্রাঙ্গণে একটি গাছ আপনাকে রোপণ করিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে আপনি চলিয়া যাইবার পরেও আমরা বলিতে পারিব, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার নিজ হাতে এই গাছটি লাগাইয়াছেন।" অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"আমি নিঃসন্তান, আমার কোথায়ও কোন চিহ্ন থাকে ইহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে।" সাহেব কিছুতেই ছাড়িবেন না; অবশেষে অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"কি গাছ লাগাইব?" সাহেব বলিল—"আপনার যে গাছ খুসী।" অশ্বিনীকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমি সরিষা গাছ লাগাইব।" ভিটায় সরিষা বোনার অর্থ সাহেব জানিতেন না বলিয়া তিনি এই রসিকতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অশ্বিনীকুমারের নির্ব্বাসনপ্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—"কারাগারে তাঁহার খাওয়া ও চিকিৎসার

বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। অনেক দামের ভাল ভাল মেওয়া তাঁহার জন্য অনেক দূর হইতে আমদানী করা হইত। তাঁহার সামান্য ইচ্ছা পূর্ণ হইতেও দেরি হইত না। অশ্বিনী-কুমারের বাস-কক্ষের বাহিরে একটি সুন্দর নিমগাছ ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়াছিলেন—"ঐ নিমগাছটির তলায় একটি সান বাঁধান বেদী থাকিলে মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় বসিতে পারিতাম, কিন্তু কাছেই যে ঐ পায়খানা রহিয়াছে দুর্গন্ধে ওখানে বসা যাইবে না।" তিনি অবশ্যই ইহা মনে করেন নাই যে, তাঁহার এই সামান্য ইচ্ছা পূরণের জন্য জেল-কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী তহবিলের অনেক টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত হইবেন। কিন্তু পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গে জানালা দিয়া দেখিলেন, পায়খানাটি ভাঙ্গিয়া সেখানকার জমি 'রোলার' দিয়া সমতল করা হইতেছে, আর নিমগাছের তলায় বেদী বাঁধাও আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না, সেই জন্য শীতকালে বারাণসী শাড়ীর পাড় কাটিয়া তাহা দিয়া তাঁহার জন্য বালাপোষ তৈয়ার করা হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে দিবারাত্রি ষোলজন ভৃত্য তাঁহাকে ব্যজন করিত। সরকারী আদরের এতটা বাহুল্য ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া তিনি কৌতুক বোধ করিতেন। তাই তিনি রহস্য করিয়া লিখিয়াছেন—

আমায় সখের কয়েদী করেছ,
খাবার শোবার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে।
পূরব জনমে যেন
কার গো সখের ময়না ছিনু
নবাব ছিল সে এই লক্ষ্ণৌ,
তাই হেথা এনেছে।
ছিল নবাব সেবারে যে
এবারে লাট হয়েছে সে
সোণার পিঞ্জর আমার
গোরা-বারিক বনেছে।
সেই সেই সুখাদ্য নানা
সেই কদলী সেই বেদানা
সেই পুরাণো টানে এসে
আবার জুটেছে।
তখন যা'বলাতে তাই বলিতাম
যা শোনাতে তাই শুনিতাম
সোণাকাণী ময়না বলে
তাই আদর করেছ।
এখন যা বলাবে তাই বলিব
যা শোনাবে তাই শুনিব
সেদিনত নাইরে যাদু,
সে বুদ্ধি ঘুচেছে।

যিনি ভক্ত, যিনি প্রেমিক, তাঁহার কাছে কোন স্থানই শূন্য নহে, খালি নহে। তিনি আপনার প্রেমানন্দ দিয়া সকল স্থান পূর্ণ করিয়া লইতে পারেন। অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ কারাগারেই বিশ্বদেবতার সুরনরলোকমাদন মঙ্গলশঙ্খ শুনিতে পাইয়াছিলেন—

জয় চক্রধর দেব বিশ্বম্ভর
ত্রিভুবন প্রতিপালকওঁ।
তব মঙ্গলশঙ্খ বাজে বাজে
অনাহত সুরনরলোকমাদনওঁ॥
কোটি জগত মাঝে রাজে রাজে
তব কুশল শাসনওঁ।
তব শ্রীকরতলপঙ্কজপরিমল
লুব্ধ ভক্তজনগণমনওঁ॥
কিবা প্রাণমন স্নিগ্ধকর
করুণোজ্জ্বলাবলোকনওঁ।
কিবা মনোমোহন সাজে সাজে
প্রেমচন্দন চর্চ্চিত চরণওঁ॥

যাহারা যথার্থ মনীষী তাঁহারা আপনার মননের মধ্যেই জীবিত থাকেন। লক্ষ্ণৌ কারাগারে অশ্বিনীকুমার গুরুমুখী ভাষা শিক্ষা করিয়া গ্রন্থসাহেব অধ্যয়ন করিয়াছেন। এখানে তাঁহার সঙ্গী ছিল—শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী দাসের রামায়ণ ও ভক্তমাল। অশ্বিনীকুমার প্রকৃত ভক্তের মত ভক্তচরিত

অধ্যয়ন করিয়া ভক্তিরসের মধ্যে আপনার মনটি ডুবাইয়া রাখিতেন। তাঁহার রক্তমাংসের দেহটা কারাগৃহে থাকিলেও তাঁহার মন অনেক সময়ে অনন্ত বিমানে বিহার করিত। এই কারাবাসকালে রচিত একটি সঙ্গীতে তিনি লিখিয়াছেন—

রক্তমাংস নিয়ে বল ক'দিন থাকা যায়।
আমি যারে আমি বলি সেত রক্ত মাংস নয়॥
রক্তমাংসের নট বহরা
টেনে টেনে হলেম সারা
কিছুতেই ছাড়েনা তারা
ছাড়ান যে দায়।
যখন রক্তমাংস ছেড়ে উঠি
আপন সুখে আপনি লুঠি
কয়েদী যেন পেলে ছুটী
বাতাস লাগায় গায়।
ঐ যে ঐ অনন্ত বিমান
ঐ ত আমার ঘরের নিশান
যেতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌
শিকল বাঁধা পায়।

৭-১-১৯০৯

আমরা এই পৃথিবীতে এমন পেচকবদন ব্যক্তিও দেখিয়াছি যাহারা কদাচিত হাসিয়া থাকে, কাতুকুতু

দিয়াও ইহাদিগকে হাসান যায় না। যাঁহারা যথার্থ রসিক, তাঁহাদের রসের প্রস্রবণ রহিয়াছে তাঁহাদের হৃদয়মধ্যে। একটু কিছু উপলক্ষ্য পাইলেই এই প্রস্রবণ হইতে আনন্দের রসধারা উথলিয়া উঠে। লক্ষ্ণৌ কারাগারের বাহিরে কোন্ এক শিশু 'বাবাজান্' বলিয়া ডাকিতেছিল ; ঐ ধ্বনি শুনিয়া অশ্বিনীকুমারের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া গাহিলেন—

শিশু ডাকে বাবাজান্
আমার আনন্দে ভাসে প্রাণ।
ও ত আমি ডাকি আমাকে, আমারি আহ্বান।
আমি পুত্র আমি পিতা,
আমি কন্যা আমি মাতা,
আমি আমার ভগ্নী ভ্রাতা আমির সমাধান।
আমি নির্গুণ আমি অরূপ
আমি সগুণ আমি স্বরূপ
আমি রস বিষকূপ দুইয়ের বিধান।
আমরি, আমার খেলা
আমি গুরু আমি চেলা
আমি সাগর আমি ভেলা আমিই তুফান।
আমি আমার গলা ধরি
আমি আমার সংহার করি
আমি মিত্র আমি অরি, বিচিত্র বিধান। ২৯।১।১৯০৯

আর এক দিন জ্যোৎস্নাধবল রজনীকালে কারাকক্ষ হইতে দূরাগত বংশীধ্বনিশ্রবণে আনন্দে আকুল হইয়া অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে নিবেদন করিয়াছিলেন—

বিনোদিয়া, তুই কি ঐ বাজাস্ বাঁশী তোর ?
মরমে গেল যে ধ্বনি প্রাণ হল ভোর।
সৃষ্টির পারেতে বসি
বাজাস্ তুই মোহন বাঁশী
কতকালের কথা আসি পশে প্রাণে মোর।
সেই সৃষ্টির আগের কথা
যেথা নাই 'আমি' নাই 'মমতা'
মনে আসে সেই বারতা যার নাই ওর।
ভাবিতে ভাবিতে তাই
বিদেহ যে হয়ে যাই
সত্ত্ব রজ'র মুখে ছাই খসে যায় ডোর।
তোর মোহন বাঁশীর তানে
কি হয় মন, মনই জানে
আমার মন যে থাকেনা মনে, ওরে মনচোর।

১৮।১।১৯০৯

যিনি আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, তাঁহার সহিত যাঁহার যথার্থ পরিচয় হয় তিনি কাহাকেও ভয় করেন না, কিছু হইতেই ভয় পান না। এই যে অভয়দাতা দেবতা মানুষের অন্তরে

বাস করেন, লক্ষ্ণৌর কারাকক্ষে তাঁহার অভয়বাণী শুনিয়া অশ্বিনীকুমার গাহিয়াছেন—

শুনি মাভৈ মাভৈ ধ্বনি মাভৈ মাভৈ।
অভয় ত হয়ে গেছি, ভয় আর কই॥
বিপদ্ পাহাড়ের মত
আস্থক না আস্‌বে কত
ওই পদে হবে হত, ব্রহ্মকবচ ওই॥
ঐ পদ থাকিলে বুকে
হাজার শত্রু আস্থক রূখে
ছাই পড়বে তাদের মুখে, হব জগজ্জয়ী॥
শোক বিপদ্ দুঃখ দৈন্য
পাপ তাপের যত সৈন্য
কাকেও না করি গণ্য, বৈকুণ্ঠতে রই॥
ও পদে মন থাকে যবে
এমন কেউ দেখি না ভবে
যারে দেখ্‌লে ডর হবে, যত ছোট হই॥

যাহারা সদানন্দ অশ্বিনীকুমারকে নির্ব্বাসনদণ্ড করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন তাঁহারা এই মহাত্মার অন্তরের খবর রাখিতেন না। তিনি কারাকক্ষের শুষ্ক প্রাচীর ও ধূলিরাশিকে আপনার অন্তরের আনন্দরসে পূর্ণ করিয়া একাকী নৃত্য করিতেন এবং ধূলিমুষ্টিকে মনের আনন্দে চুম্বন করিতেন। অশ্বিনীকুমারের এই আনন্দ, এই

স্ফূর্ত্তি কারাগারে রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছে—

স্ফূর্ত্তি মন্ত্রের পূজক আমি স্ফূর্ত্তি আমার ধ্যান।
স্ফূর্ত্তি আমার জপ তপ স্ফূর্ত্তি আমার দান।
আমি যার করি পূজা
সে স্ফূর্ত্তি মুলুকের রাজা,
স্ফূর্ত্তিতে তার বাজ্‌ছে বাজন স্ফূর্ত্তির হচ্ছে গান।
স্ফূর্ত্তি থেকে সৃষ্টি হয়
স্ফূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড রয়
স্ফূর্ত্তিতেই হয় লয়, স্ফূর্ত্তির বিধান।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ভাবের এই স্বর্গলোকেই অশ্বিনীকুমারের চিত্ত দিবারাত্রি বিহার করিত, তিনি কখনও বিচ্ছেদবেদনা বা কোনরূপ দুঃখ অনুভব করিতেন না, কিন্তু আমরা ইহা বলি না। তিনি বলিয়াছেন—"একদিন কেমন হইল, অনেক দিন অনাথের (ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত সুকুমার দত্তের) চিঠি পাই না। ভয়ানক কান্না পাইতে লাগিল। খানিকটা কাঁদিলাম, পরক্ষণেই মনে হইল আমি কি পাগল? এ কি করিতেছি?"

সাময়িক দুর্ব্বলতা মানুষ মাত্রেরই আসে, অশ্বিনীকুমার সেই দুর্ব্বলতার ধূলি মুহূর্ত্তমধ্যে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাঁহার মন প্রেম-মধুধারা ভরিয়া লইতে পারিতেন। কারাগারেই স্বরচিত এই সুললিত সঙ্গীতে তিনি তাঁহার এই মহাভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

তুমি মধু মধু মধু মধু মধু।
মধুর নির্ঝর, মধুর সায়র, আমার পরাণ বঁধু॥
মধুর মূরতি, মধুর কীরতি, মধুর মধুর ভাষ;
মধুর চলনি, মধুর দোলনি, মধুর মধুর হাস॥
মধুর চাহনি, মধুর সাজনি, মধুর রূপের লেখা,
মধুর মধুর মধুর মধুর মাহেন্দ্র ক্ষণের দেখা॥
ও মধু রূপের মধুর কাহিনী মধুর কণ্ঠে গায়
শুনিতে শুনিতে গলিতে গলিতে প্রাণ মধু হয়ে যায়॥
(তখন) অনল অনিলে জলে মধু প্রবাহিণী চলে,
মেদিনী হয় মধুময়।
(তখন) প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়॥
(তখন) যেরূপ ভাতে যেখানে, যে কথা পশে গো কাণে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর।
(তখন) বজ্ররব মেঘধ্বনি গুরু সোম রাহু শনি,
মধুরসে সকলই ভরপূর॥ ১৯, ১০, ১৯০৯

যথার্থ ভক্তের মত অশ্বিনীকুমার আপনাকে দীনহীন সেবক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজেকে বড় মনে করিয়া অন্তরে কোন প্রকার অভিমান পোষণ করিতেন না; স্নেহাস্পদ বন্ধুদের শত তাড়নায়ও তিনি তাঁহার জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে সম্মত হন নাই। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"অশ্বিনী-

কুমার যখন অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহাকে একখানা বাঁধা খাতা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাঁহার জীবন-চরিত লেখার জন্য। সেই খাতা সেই অবস্থায়ই তাঁহার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "খাতা যে অবস্থায় আসিয়াছে ইহাই আমার জীবনচরিত। বাঁধান খাতার কঠিন দুই মলাট—উপরেরটি জন্ম, পিছনেরটি মৃত্যু, আর ভিতরের সব পাতাগুলি শাদা, অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর মাঝখানে যে জীবন তাহা (Blank) ফাঁকা।"

১৯০৯ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসন হইতে মুক্তিলাভ করেন।

অশ্বিনীকুমারের বরিশাল সহরের বাড়ী

# পঞ্চম অধ্যায়

## পরিবারে অশ্বিনীকুমার

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ সরলকুমার দত্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত অশ্বিনীকুমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আমরা যে তাঁহার বুকে আশ্রয় পাইয়াছি, সেই ভাবেই তাঁহার জীবদ্দশায় আমাদের দিন কাটিয়াছে। পিতার অভাব তিনি কোন দিন বোধ করিতে দেন নাই এবং একাধারে তাঁহার নিকট হইতে মাতাপিতার স্নেহ পাইয়াছি। তাই তাঁহার কথা লিখিতে যাইয়া ব্যক্তিগত কথাই হয়ত অধিক থাকিবে, সেইজন্য ক্ষমা করিবেন। জ্যেঠামহাশয়ের স্নেহ ও আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া যে কতদূর অনাথ ও দীন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না।

আমাদের জীবনে ৺জ্যেঠামহাশয় যে কতখানি ছিলেন, তাহা কেবল তাঁহাকে হারাইয়াই ভাল করিয়া বুঝিতেছি, তিনি জীবিত থাকিতে আমাদের বুঝিতে দেন নাই। আমাদের সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন কবিয়া ৺জ্যেঠামহাশয় ছিলেন জীবনপথে প্রধান ও পরম সম্বল। সংসারে আমাদের ভালমন্দ কোন কাজই আমরা বিচারবুদ্ধিতে করিতে পারি নাই। শুধু ভাল কাজ করিলে ৺জ্যেঠামহাশয় খুসী হইয়া

আদর করিবেন, ইহাই ছিল পরম পুরস্কার। অন্যায় করিলে তাঁহার মুখ কালো হইবে, আমরা তাহা সহিতে পারিতাম না। আজ কীর্ত্তিখ্যাতি শুষ্ক বোঝার মত মনে হইতেছে—কারণ এই সকলের পিছনে যে হাসিটুকু ছিল, তাহা আমরা হারাইয়াছি।

আমরা জ্যেঠামহাশয়কে পারিবারিক জীবনের মধ্যেই পাইয়াছি এবং পরিবারের মধ্যে তিনি জীবিত থাকিতে যে ছন্দ ও সুর জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, আজও তাহার কিছু কিছু আছে। ছেলেবেলায় আমাদের মানুষ করিয়া তুলিবার ভার তাঁহার উপরই ছিল এবং এই কর্ত্তব্য তিনি একটু স্বতন্ত্র রকমেই করিতেন। যতদূর আমার মনে হয়, শৈশবে আমাদিগকে কোন নীতিকথা বুঝাইয়া কেহ শিক্ষা দেন নাই—৺জ্যেঠামহাশয়ও কোন দিন বলেন নাই, "এ কথা বলিস্‌নে বা এ কাজ করিস্‌নে।" কিন্তু এমন ভাবেই আমাদের ভালবাসিতেন যে, অন্যায় দুর্নীতিপূর্ণ কোন কাজ করিতেই পারিতাম না, পাছে তিনি দুঃখ পান তাহাই ছিল আমাদের ভয়। মিথ্যা কথা বলা, থিয়েটার দেখা বা অন্য কোনরূপ বিলাসিতা বা ব্যসন ৺জ্যেঠামহাশয়ের জীবদ্দশায় আমাদের পরিবারে স্থান পায় নাই—কারণ তাহাতে তিনি খুসী হইতেন না। তিনি নিজে জীবনে কোন দিন থিয়েটার দেখেন নাই বা বিলাসিতা কি জানিতেন না। বাড়ীর ভৃত্যবর্গও কোনরূপ চুরি বা অপকার্য্য করিত না, কারণ

কর্ত্তা টের পাইলে দুঃখ পাইবেন। ৺জ্যেঠামহাশয়ের খুসী ও ইচ্ছানুযায়ী চলাই ছিল আমাদের পরিবারের প্রধান নিয়ম ও পরম পরিতোষ।

অনেক সময়ে ঐরূপ মতামতের স্বাধীনতা দেখিয়া বাহিরের লোক একটু বিরক্তও হইতেন এবং আমাদের বাড়ীর ভৃত্যগণ এইজন্য একটু বেহায়া বলিয়া বদ্‌নাম লাভ করিয়াছিল। আমার মনে আছে, আমাদের বি, এম, কলেজে যখন সরকারী সাহায্য লওয়া হয় জ্যেঠামহাশয় আমাদের প্রত্যেককে ডাকিয়া সরকারী সাহায্য লওয়ার সুফল ও কুফল সোজা কথায় বুঝাইয়া ছেলেপিলে, কর্ম্মচারী ও ভৃত্য সকলেরই মতামত জানিয়া লইয়াছিলেন। বিষয়-সংক্রান্ত কোন কথাই আমাদের পরিবারে কাহারও কাছে গোপন নাই। তাহাতে অনেক কথা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় ক্ষতিও হইয়াছে যথেষ্ট। কিন্তু এই ক্ষতি অনিবার্য্য ছিল, কারণ পরামর্শ সভায় ৺জ্যেঠামহাশয় সকলকেই আহ্বান করিয়া লইতেন।

বাহিরের এত কাজে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি পরিবারের কোন কর্ত্তব্য কখনও ভুল করেন নাই। কাহার অসুখ হইয়াছে, কে বাড়ীতে নাই, রাত্রিতে ঘোড়াটা ক্ষুধার তাড়নায় ডাকে, খুঁটিনাটি সকল খবরই তাঁহার জানা থাকিত। দীর্ঘ নির্ব্বাসনে থাকিয়া তিনি আমাদের কাছে যে পত্র লিখিতেন তাহা পড়িলেই সকল কথা স্পষ্ট হইবে। পত্রে তিনি

কত ধর্ম্মকথা, কত সুন্দর আখ্যায়িকা লিখিয়া আমাদের উপদেশ দিতেন, আবার আমাদের পত্রে তারিখ দেওয়া না থাকিলে ত্রুটি ধরিতেন। সকলের খবর না লিখিলে দুঃখিত হইতেন। এমন কি আমাদের ঘোড়ার খবর, প্রাঙ্গণের আমলকী, তমাল ও ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছের খবর, বিষ্ণুমন্দিরের খবর—সকল কথা বিভিন্ন দফায় সবিশেষ লিখিয়া জানাইতে হইত। আজ সংসারে প্রবেশ করিয়া পদে পদে ভুল হইয়া যায়, নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতেছে, আর সজল নয়ন হইয়া জ্যেঠামহাশয়ের কথা ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি।

লোকনিন্দা হইলে ৺জ্যেঠামহাশয় বলিতেন "আচ্ছা একটু হোক তাতে ক্ষতি কি?" গুরুতর আর্থিক ক্ষতি হইলে বলিতেন "যানে দেও"। বাড়ীতে কোন বিপদ্ হইলে বলিতেন, "সংসারে এ ত আছেই, এর জন্য কি সব চলে যাবে।" তাঁহার মনের অফুরান আনন্দের কাছে যেন কোন দুঃখের স্থান ছিল না। বর্ষাধিক কাল শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিয়াও বলিতেন, "নালিশের আছে কি, ৬৮ বছরত বেশ কেটেছে, এক বছর শুয়ে থাকার জন্য নালিশ কিসের।" Stroke হওয়ার পরে যখন কথায় ভুল হইত, তখন ভুল করিয়া তিনি নিজেই হাসিয়া কুট্‌পাট্ হইতেন, বলিতেন—"ভক্তিযোগ হয়ে গেছে, কর্ম্মযোগও সারা, এখনকার পালা হচ্ছে গোলযোগ"। তাঁহার এই আনন্দপূর্ণ উদ্বেগহীন সরল মনটি

জগতে সকল দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া চলিত এবং আমাদেরও মনে কথঞ্চিৎ এই ভাব সংক্রামিত করিয়া দিত। মনে এই সুন্দর ভাবটি লাভ করিতে আমাদের কোন বিপুল প্রয়াসের প্রয়োজন হয় নাই। ভগবানই আমাদের এই বিষয়ে ভাগ্যবান্ করিয়া দিয়াছিলেন।

শাসন আমাদের পরিবারে ছিল একটু বিভিন্ন রকমের। বাহির হইতে আমাদের বাড়ী দেখিতে গেলে মনে হইত যেন একটি হোটেলে কতকগুলি লোক একত্র বাস করে—কোন শাসন নাই। উপহাস করিয়া আমাদের বাড়ীকে অনেকেই বলিতেন. "অশ্বিনী দত্তের হোটেল।" কিন্তু একটু বেশী দিন থাকিলেই শাসনের বিশেষত্ব বোঝা যাইত। ৺জ্যেঠামহাশয় আমাদের কোন দিন ভয় দেখাইয়া শাসন করেন নাই, করিতে পারিতেনও না। কি আশ্চর্য্য উপায়ে তিনি আমাদের এই বৃহৎ পরিবারের সকলকে একটি মালায় গাঁথিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হই। গালাগালি, প্রহার, ভ্রূকুটি ইত্যাদি আমাদের বাড়ীতে কাহারও কোন দিন জানা ছিল না। আমাদের আচারপদ্ধতির স্বাধীনতা কোনদিন কঠোর শাসনে খর্ব্ব করা হয় নাই। যাহা কিছু নিয়ম ও শৃঙ্খলা পরিবারে ছিল, তাহা আপনা হইতেই আসিয়াছিল। আমাদের আত্মসম্মান জাগাইয়া দিয়া, বিচারবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যবোধ জাগাইয়া দিয়া ৺জ্যেঠা-মহাশয় আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত করিতেন। খাওয়া দাওয়ায়

দেরি করিলে বলিতেন, "তোমরা ঠাকুর কি পরিশ্রম কচ্ছে বোঝনা, তাকে তোমাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত।" চাকরকে বেশী খাটাইলে বলিতেন—"চাকর তোমার সাহায্য করবে —ওকে দিয়ে সব কাজ করান উচিত নয়।" ইত্যাদি। আমার মনে আছে একবার একটি মুসলমান ভৃত্য ইদের দিনে কয়েক সের ভাল চাল চুরি করে, পরামর্শ বৈঠকে স্থির করিয়া আমরা ৺জ্যেঠামহাশয়কে বলিলাম—"ওকে পুলিশে দিন।" অমনি তিনি বলিলেন, "ছি, ছি, আমার বাড়ীর লোককে শাসন করবে অন্যে—লজ্জার কথা, আর তাতে কি ওর কোন সম্মান থাক্‌বে, সে হবে না—যা হয় আমরাই ওকে শাসন করে দেব।" আমরা সকলে এমন কি ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত অশ্বিনীবাবুর বাড়ীর লোক বলিয়া শ্লাঘা বোধ করিতাম। ৺জ্যেঠামহাশয় তাহাতে সায় দিতেন এবং এইজন্য বিশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন বা অন্যায় কার্য্য করিতে আমরা সাহস পাইতাম না।

আর একটি মজা আমাদের বাড়ীতে ছিল, যাহা আজকাল বড় দেখা যায় না। সমাজের বাহিরে যাহারা, লোকে যাহাদের দূরে রাখিয়া দেয়, আমাদের বাড়ীতে তাহাদের আনাগোনা ছিল। একদিকে পাগল, চরিত্রহীন, গঞ্জিকাসেবী, আর অন্যদিকে সন্ন্যাসী, এখানে সকল রকমের লোকের ভিড় হইত। সকলেই জ্যেঠামহাশয়ের অতি প্রিয় ছিল এবং সকলেই ভাবিত—"বাবু আমাকেই ভালবাসেন বেশী"। পাগল

সর্ব্বদমন, গাঁঞ্জিকাসেবী গুরুজান, আজিজ পাগলা, ভেগাই হালদার সকলেই আমাদের বাড়ীকে তাহাদের আপন বাড়ী মনে করিত। খাওয়া দাওয়া এবং অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বড় বড় অতিথি এবং ঐই শ্রেণীর লোক সকলেরই পরিবেশন সমভাবেই চলিত। ইহাদের কেহ ৺ জ্যেঠামহাশয়ের সহিত এক তক্তপোষে বসিয়া গল্প করিত, কেহ তাঁহাকে দোস্ত ডাকিত, কেহ আবার গঞ্জিকা সেবন বা অন্য কোন কাজের জন্য আবদার করিয়া ধমকাইয়া পয়সা লইয়া যাইত, যেন পয়সাগুলি তাহাদের গচ্ছিত ধন। সন্ন্যাসীর জন্য আমাদের বাড়ীর দ্বার ত সর্ব্বদাই মুক্ত ছিল। তাঁহারা কেহ মাসাধিক কালের কম আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না।

একবার আমাদের বাড়ীতে একটি পাগল ও কোন সন্ন্যাসী এক সময়ে আসিয়া স্থান লয়। পাগলটি সন্ন্যাসীর গেরুয়া বস্ত্র দেখিয়া ও নিশীথে নাম কীর্ত্তন শুনিয়া চটিয়া যায় এবং এই সন্ন্যাসীকে স্থান দেওয়ার জন্য তিরস্কার করিয়া বলিত—"এ একটা মস্ত পাগলের আডডা এখানে থাকা আমার সম্ভব নয়"। সন্ন্যাসী আবার চরিত্রহীনের আশ্রয়প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি ৺ জ্যেঠামহাশয়কে বলিলেন "এসব লোককে স্থান দেওয়া কেন?" জ্যেঠামহাশয় একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন—'এ বাড়ীটা একটা চিড়িয়াখানা। আমার মাথাতেও একটু ছিট্ আছে। তাই চিড়িয়াখানায় থাকিতেই ভালবাসি।'

আজ কিন্তু আমাদের বাড়ীর সে আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই নানাবিধ লোকের পদধূলিপূত তীর্থস্থান আর নাই। উৎসবান্তে দীপহীন ত্যক্ত মন্দিরের মত অন্ধকারে নীরব হাহাকার পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগাইয়া দিতেছে। কে জানে কবে আবার আমাদের গৃহ উৎসব-মুখরিত হইয়া হাসিয়া উঠিবে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## গ্রন্থকার অশ্বিনীকুমার

### ভক্তিযোগ

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় বঙ্গের বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের অভিমত লইয়া বঙ্গভাষার একশতখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকের এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের "ভক্তিযোগ" উক্ত উৎকৃষ্ট শত পুস্তকের অন্যতম ছিল। এই পুস্তক যখন প্রকাশিত হয় তখন সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—"আমার বিশ্বাস যে, এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমি বাঙ্গালা ভাষায় সংপ্রতি দেখি নাই অথবা বাঙ্গালা ভাষায় অল্পই দেখিয়াছি।" স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"আমি আপনার গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে কত পরিতৃপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, আপনার পুস্তক পাঠে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন। বিশেষতঃ উদাহরণগুলি অতি চমৎকার হইয়াছে।"

অশ্বিনীকুমারের গুণ-মুগ্ধ দেবগৃহের ঋষি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "ভক্তিযোগ" পাঠে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে

লিখিয়াছিলেন—"তুমি বরাবরই আমার প্রিয় কিন্তু এই গ্রন্থ-প্রকাশে তুমি "প্রিয়াবতারে খলু ন সতী" নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা আমার প্রিয় হইলে। তুমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এই গ্রন্থ লিখ নাই, সকল সম্প্রদায়ের জন্য লিখিয়াছ, ইহা আমার বিশেষ সন্তোষের কারণ হইয়াছে। রিপু-দমন যাহা পৃথিবীতে সকল কার্য্য অপেক্ষা কঠিন এবং যাহাতে বড় বড় ধার্ম্মিক লোক হার মানেন এবং যাহাতে এমন কি আমাদিগের কোন কোন প্রধান প্রাচীন যোগী মুনির অক্ষমতার নিদর্শন পুরাণে বর্ণিত আছে, সে বিষয়ে তুমি তোমার গ্রন্থে অনুষ্ঠানযোগ্য কার্য্যকরী অনেক নিয়ম ও প্রকরণাবলীর ব্যবস্থা দিয়াছ। সেই সকল নিয়ম পালন ও প্রকরণাবলীর অনুসরণ করিলে পাঠক রিপু-দমনে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

"তুমি যেখানে ঈশ্বরপ্রেমের বিষয় লিখিয়াছ সেই সকল স্থান অমৃত; সেই অমৃত—যাহা দেবতারা তাঁহা হইতে নহে, তাঁহাতে অহর্নিশ পান করিতেছেন। শিশু যেমন মাতৃবক্ষে সংলগ্ন হইয়া স্তন্য পান করে, তাহার হস্ত হইতে তাহা পায় না, সেইরূপ দেবতারা ঈশ্বর বক্ষে একেবারে সংলগ্ন হইয়া, সেই বক্ষের সহিত একীভূত হইয়া, সেই ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতধারা পান করিতেছেন। এই জন্য "তাঁহাতে" শব্দ ব্যবহার করিলাম "তাহা হইতে" নহে। তুমি ভক্তিব যে সকল লোমহর্ষক ও অশ্রু-নিঃসারণকারী গল্প

তোমার গ্রন্থে বলিয়াছ, তাহা চমৎকার। এত রত্ন তোমার মনোভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। ঐ সকল গল্প স্মরণ করিয়া "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহু, হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ"। তুমি পরিশেষে এমন গ্রন্থ রচনা করিয়াছ যাহা মানববর্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিস্মৃতি-সাগরে লীন হইতে দিবে না।"

বস্তুতঃই 'ভক্তিযোগ' চিরকাল আদৃত হইবার মত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যাহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাহাদিগকে ইহা এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সরল ও আন্তরিক সমালোচনা অতিরঞ্জিত নহে। অশ্বিনীকুমার যদি শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে যশোভাজন হইতে নাও পারিতেন, তথাপি "ভক্তিযোগ-প্রণেতা" বলিয়া চিরঅমরতা লাভ করিতেন, এইরূপ মনে হয়। 'ভক্তিযোগ" মৌলিক গ্রন্থ না হইতে পারে, শিল্প ও সৌন্দর্য্যের বিচারে সাহিত্যিকেরা এই গ্রন্থখানিকে সাহিত্য-সৃষ্টির উচ্চ শ্রেণীতে স্থান দান করিবেন বলিয়াও মনে হয় না, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা এই গ্রন্থখানি কোনদিন বিস্মৃত হইবেন, বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গভাষায় যুবক ও বালকদের উপযোগী সুনীতিগ্রন্থ এমন আর একখানিও নাই।

যিনি রস-স্বরূপ সেই পরম দেবতার প্রতি পরানুরক্তি এবং তাঁহার বিমল সৌন্দর্য্য সম্ভোগই মানব-জীবনের গৌরবময় পরিণাম। সাধারণ মানুষও পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া

কি প্রকারে এই চরম গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে "ভক্তিযোগে" তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমার বহুভাষাবিৎ ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। উপনিষৎ, গীতা ও ভাগবত তাঁহার একরূপ কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার স্মৃতি-শক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি অভিনিবেশ-সহকারে যাহা পড়িতেন কখনও তাহা বিস্মৃত হইতেন না। টেনিসন্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বাইরন্, সেলি প্রভৃতি কবিদিগের সুদীর্ঘ কবিতা তিনি পরমানন্দে আবৃত্তি করিতেন। হাফেজের কবিতা তাঁহার মুখে প্রায় সর্ব্বদা শুনা যাইত। ভক্ত অশ্বিনীকুমারের "ভক্তিযোগ" নানা শাস্ত্রমথিত অমূল্যরত্ন। এই গ্রন্থ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

১২৯৪ অব্দে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অশ্বিনীকুমার ভক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন উক্ত বক্তৃতাগুলির মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করিয়া 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বরিশাল সহরের 'কাশীপুর' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় উক্ত বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছিলেন। তিনি এই পুস্তক সমালোচনায় লিখিয়াছেন—"বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অশ্বিনীবাবু ভক্তিযোগ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তদবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। আমরা সেই বক্তৃতাগুলি শ্রবণ করিয়াছিলাম। যখন অশ্বিনীবাবু বক্তৃতা করিতেন, তখন সভাস্থ সকলে

অনন্যমনা হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। কখনও হাসির রোল পড়িত কখনও নয়নাশ্রু পতিত হইত। আমরা জানি এই বক্তৃতাদ্বারা অনেকের জীবন-স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ভক্তিযোগের ন্যায় গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ শীঘ্র বাহির হয় নাই। ধর্ম্মজীবন যাঁহারা গঠন করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ত ভক্তিযোগ অমূল্য রত্ন। চিন্তাশীলতা যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের নিকট ভক্তিযোগ বড়ই আনন্দপ্রদ। নানা শাস্ত্রমথিত বহুমূল্য রত্নাবলীর যাঁহারা একত্র সমাবেশ দেখিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ মধুর হইতেও মধুর হইবে।"

ভক্তিযোগের বক্তৃতাগুলি শ্রোতাদের মনের উপর কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য হইতে আমরা তাহা অবগত হইলাম। এইরূপ না হইবেই বা কেন? একে ত ভক্তির কথা স্বভাবতঃই সুমধুর, তারপর সেই ভক্তি-তত্ত্ব যিনি ব্যাখ্যা করিতেন তিনিও ভক্ত, শিশুকাল হইতেই হরিনামরসে মাতোয়ারা।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার গ্রন্থারম্ভে ভক্তি কাহাকে বলে নানা শাস্ত্রবাক্য হইতে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন; ভগবৎপদে যে একান্ত রতি তাহারই নাম ভক্তি। যাঁর মুকুন্দপদে এইরূপ আনন্দসান্দ্রা ভক্তি হয় মোক্ষ স্বয়ং আসিয়া তাঁর পায়ে লুণ্ঠিত হয়। ভক্ত মুক্তির জন্য লালায়িত হন না, মুক্তিই তাঁহার পদাশ্রয়ের জন্য লালায়িত; যাহাতে মোক্ষপদ তুচ্ছ

এমন ভক্তির নাম অহৈতুকী ভক্তি। প্রহ্লাদের প্রাণে প্রথম হইতেই এই ভক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। তিনি দিবানিশি কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন। মুখ্যা ভক্তিও ইহারই নাম। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন ভক্তি হইতে পারে না। ইহার নিম্নস্তরে যে ভক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাকে ভক্তি না বলিলেও দোষ হয় না। কিন্তু মন্দ ব্যক্তিও তাহার নিকৃষ্ট ভক্তি সাধন করিতে করিতে উচ্চ ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। এই জন্য গৌণী ও হৈতুকী ভক্তিও উপেক্ষণীয় নহে।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে এই আশার কথা শুনাইয়াছেন—"ক্রমাগত শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রশ্রবণ এবং ভগবানের স্বরূপ প্রতিপাদক তর্ক করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে ভগবদ্বিষয়ে মতি হয়, তাঁহাতে ভাব হয়। অমন মধুর বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে তাহাতে লোভ না হইয়া যায় না। লোভ হইলে প্রাণের টান হয়, টান হইলেই রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়। ভগবানের নাম উপর্য্যুপরি শুনিতে শুনিতে মানুষ ক'দিন স্থির থাকিতে পারে? কত নাস্তিক ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে পাগল হইয়া গিয়াছে।"

"যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্ত হইতে চান, ভগবান্ তাহার সহায়, তাহার বাঞ্ছা সিদ্ধ হইবেই। কেহ যেন এমন কথা মুখেও আনেন না যে, এ সংসারে ভক্ত হইবার উপায় নাই, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি ভয়ানক দোষারোপ করা হয়।

কেহ দুরাচার হইয়াও ভগবানকে ডাকিলে সে অল্পদিনের মধ্যে ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। তবে আর নিরাশ হইবার কারণ কোথায়? সকলেই বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, ভগবান্ সকলকেই কৃতার্থ করিবেন। আমরা যত জগাই মাধাই আছি সকলেই উদ্ধার হইয়া যাইব।''

"চুম্বক পাথর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। কাদামাখান লৌহখণ্ডের মত বলিয়াই আমরা তাহাতে লাগিতে পারিতেছি না, কাঁদিতে কাঁদিতে যাই কাদা ধুইয়া যাইবে অমনি টক্ করিয়া তাহাতে লাগিয়া যাইব। তাঁহাকে ডাকিতে হইবে এবং পাপের জন্য কাঁদিতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহার কৃপার অনুভূতি হইবে। ইহাতে বিদ্যা, ধন ও মানের প্রয়োজন নাই। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে পান।"

"ভগবানকে ডাকিবার এবং তাঁহার কৃপা উপলব্ধি এবং তাঁহাতে প্রাণ সমর্পণ করিবার পথে কতকগুলি বাধা আছে। কুসঙ্গ, কুচিত্র দর্শন, কুসঙ্গীত শ্রবণ, কুগ্রন্থ অধ্যয়ন প্রভৃতি ভক্তিপথের বাহিরের কণ্টক। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, পাটওয়ারি বুদ্ধি অর্থাৎ কৌটিল্য, বহ্বালাপের প্রবৃত্তি, কুতর্কেচ্ছা, ধর্ম্মাড়ম্বর এবং লোকভয় প্রভৃতি ধর্ম্মপথের মানস কণ্টক।"

ভক্তিপথের এই বাহ্য ও মানস কণ্টকগুলি দূর করিবার কার্য্যকরী উপায় নির্দ্দেশ করিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন—

আত্মচিন্তা ভক্তিপথের প্রধান সহায়। প্রত্যেক দিন যদি আমরা ভাবিয়া দেখি—কি অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছি, সৎকার্য্য কত করিয়াছি, অসৎ কার্য্যই বা কত করিলাম, পাপের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিতেছি—তাহা হইলেই নিজের যথার্থ অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিব। এইরূপে যিনি নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া থাকেন তিনিই ভগবানকে ডাকেন। ইহা হইতে ভক্তির প্রথম সিঁড়ি পত্তন হইতে পারে। কুসঙ্গ যেমন ভক্তিপথের কণ্টক সৎসঙ্গ তেমনি ভক্তিপথের সহায়। সাধুগণ তাঁহাদের সদুপদেশরূপ কিরণমালা দ্বারা লোকের হৃদয়ের পাপ অন্ধকার সর্ব্বতোভাবে নাশ করেন। যিনি প্রাণের সহিত ভগবৎ কথা বলেন, আমাদিগের তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পাইব। "সঙ্গগুণে রং ধরবেই নিশ্চয়।" সাধুসঙ্গে কি উপকার হয় জগাই মাধাইএর উদ্ধার উহার দৃষ্টান্ত।

যিনি যে দেবতার উপাসক তিনি সেই দেবতার পূজা আরাধনা করিলে ভক্তিলাভ করিতে পারেন। যাহারা মূর্ত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না তাহাদিগের পক্ষে প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিন্তা

ও লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতি করাই কৃষ্ণসেবা। বিশ্বময় ভগবানের আশ্চর্য্য রচনাকৌশল ও বিবিধ খেলা দেখিলে কাহার না প্রাণ তাঁহাতে ডুবিয়া যায়?

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ বিশেষ উপকারী। ভগবানের স্বরূপবর্ণন, লীলাকীর্ত্তন, শক্তিপ্রচার ও ভক্তদিগের কাহিনী যে গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেইগুলি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে মন ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও জপ ভক্তিপথের প্রধান সহায়। ভগবানের নাম ও লীলাকীর্ত্তনরূপ ব্রত যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ে অনুরাগের উদয় ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়। বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সংকীর্ত্তন করার ন্যায় আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সত্য সত্যই তখন আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, বিষয়-বাসনা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য তিরোহিত হয়। নামকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমের সঞ্চার ও পাপ নাশ হয়।

নাম জপ করিতে হইলে নামের অর্থ ও শক্তি জানিয়া লইতে হইবে। যিনি যে নাম মন্ত্র-স্বরূপ জপ করিবেন উহার অর্থ ও শক্তি তাঁহার জানা আবশ্যক। যে সাধক মন্ত্রের অর্থ কিংবা শক্তি জানেন না তিনি শত লক্ষ বার জপ করিলেও তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। ক্রমাগত নাম জপ করিলে কি লাভ হয় তাহা ভক্ত কবীর আপন জীবনে বুঝিতে

পারিয়াছিলেন। কবীর তাঁহার দোঁহায় ব্যক্ত করিয়াছেন—"কবীর তুমি তুমি করিতে করিতে তুমি হইয়া গেল, তোমাতেই মগ্ন হইয়া রহিল, তোমাতে আমাতে মিলাইয়া গেল, এখন আর মন অন্যদিকে যায় না।" জপ করিতে করিতে সাধক এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, ভগবানে ডুবিয়া যান, চারিদিকে তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

তীর্থ ভ্রমণ বা তীর্থে বাস করিলে হৃদয়ে ভক্তির ভাব জাগরিত হয়। তীর্থকে পুণ্যস্থল বলে কেন? ভূমির কোন অদ্ভুত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেজ কিংবা মুনিদিগের অধিষ্ঠান জন্য তীর্থ পুণ্যস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

(জ্বালামুখী তীর্থে গিরিনিঃসৃত বহ্নিশিখা, সীতাকুণ্ডে জলের উষ্ণ প্রস্রবণ, কেদারনাথে তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, হরিদ্বারে প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী দর্শন করিলে কাহার না প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়?) আর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের লীলা মনে করিয়া, অযোধ্যায় রামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিয়া কাহার না হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হয়? আর কেবল সাধুস্মৃতির কথাই বা বলি কেন? তীর্থস্থলে মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কত লোক কৃতার্থ হইয়াছেন তাহা মনে করিলেও প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়।

ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কোন কার্য্য করিব না, কোন বাক্য বলিব না, কোন চিন্তাকে মনে স্থান দিব না

যদি একবার এইরূপ ভাব হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া লইতে পারি তবে আপনা হইতে প্রাণ ভক্তিতে ভরিয়া যাইবে। সকল বিষয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিলে মানুষ তাঁহাতে আকৃষ্ট না না হইয়া পারে না।

অতঃপর ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই এই পাঁচ প্রকার ভক্তিরস ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যান শেষ করিয়াছেন।

ঈশ্বরে যখন নিষ্ঠা হয়, সংসারাসক্তি যখন লোপ পায় তখনই মন শান্ত হয়। শান্তরস ভক্তির প্রথম সোপান। পরমেশ্বর যে পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা শান্তরসে ভক্তের চিত্তে এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

দাস্যরতিতে ভক্তের মনে মমতার সঞ্চার হয়। তিনি ভগবানের সেবা করিতে ব্যস্ত হন। কৃষ্ণসেবা ভিন্ন তাঁহার আর কিছু ভাল লাগে না। তিনি ভগবানের নিকট কিছুই কামনা করেন না, কেবল তাঁহার সেবা করিতে চাহেন।

সখ্যরসের প্রধান লক্ষণ ভক্তের নিকট ভগবান্ অপেক্ষা কেহ প্রিয়তর নহেন। গুহরাজ বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা কেহ আমার প্রিয়তর নাই।" যে ভক্ত প্রাণের ভিতর ভগবানের সহিত ক্রীড়া করেন, তিনিই সখ্যরসের মাধুরী সম্ভোগ করিতে পারেন। সখ্যরতিতে ভক্ত ভগবানকে আপনার অলঙ্কার করিয়া লন। বৃন্দাবনের পথে অন্ধ

বিল্বমঙ্গলের পথপ্রদর্শক কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক তাঁহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে তিনি বলিয়াছিলেন—"হে কৃষ্ণ, তুমি বলপূর্ব্বক হস্ত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? হৃদয় হইতে যদি দূর হইতে পার, তবে তোমার পৌরষ আছে মনে করিব।" ভক্ত তাঁহার সখাকে একেবারে হৃদয়ের অলঙ্কার করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ভগবানের আর পালাইবার পথ নাই।

বাৎসল্যরসে ভগবান্ গোপাল। ভক্ত তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আদর করেন, স্নেহ করেন, ক্রোড়ে তুলিয়া লন। মা যশোদার নিকট ভগবান্ গোপাল-বেশে উপস্থিত হইয়া প্রেম ভিক্ষা করিতেন, তিনি তাঁহাকে একটু আদর দেখাইয়া পরে বিমুখ করিতেন, আবার যদি তিনি অন্তর্হিত হইলেন, অমনি গোপাল-হারা ভক্ত অনুতাপে ছট্‌ফট্ করিতেছেন।

প্রাণে মধুর রসের সঞ্চার হইলে—"সতী যেমন পতি বিনে অন্য নাহি জানে"—ভক্তও তেমনি ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু জানে না। এই অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান্—সতী ও পতি। শ্রীচৈতন্য এই ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। চৈতন্য ও ভগবান্—রাধা ও কৃষ্ণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যিনি এই মধুর রসে ডুবিয়াছেন তাঁহার আর বাহিরের ধর্ম্মকর্ম্ম থাকে না। তিনি 'বেদবিধি ছাড়া'। পাগল হাফেজ এই জন্যই তাঁহার শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম মধুর রসের পরম আদর্শ।

এই রসের আবেশে প্রাণে কি ভাবের উদয় হয় আমরা তাহার কি বুঝিব। তখন হৃদয়বল্লভকে বুক চিরিয়া হৃদয়ের ভিতরে পুরিয়া রাখিলেও পিয়াস মিটে না। ভগবানের সঙ্গে বুকে বুকে, মুখে মুখে থাকা যে কি, তাহা আমরা কি কিছু বুঝিতে পারি? এই ভাবের আবেশে বিভোর হইয়া বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন—"এই বিভুর শরীর মধুর; মুখখানি মধুর, মধুর, মধুর: অহো, মৃদু হাসিটি মধুগন্ধি—মধুর, মধুর, মধুর, মধুর।"

ভক্তির চরমোৎকর্ষ এই পর্যান্ত। ইহার পর কি তাহা কে বলিবে?

'ভক্তিযোগ' ইংরাজী ও ভারতীয় বহু ভাষায় অনূদিত হইয়া সমগ্র ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের মনস্বী সমালোচক ষ্টপফোর্ড ব্রুক এবং অধ্যাপক টনি সাহেব এই সদ্‌গ্রন্থখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

Rev. Stopford A. Brooke, M. A., LL. D. লিখিয়াছেন—

"Since I have read, I have been in another world than this noisy world of the West, where we spend our days in pursuing nothing which we think everything, and I have felt as if I could live otherwise. And in my old age I shall have time to assimilate, I hope, a great

deal of that which this book of yours ought to give to me, I am grateful to you for it.

The way it has been done will help us over here to take in and digest its lessons. The little stories which illustrate your points of thought and practice are of great interest, and I am personally delighted with the quotations from the poets of India. The life of that great country is made clearer and nearer to me."

## কর্ম্মযোগ

অশ্বিনীকুমারের কোন স্নেহাস্পদ বন্ধু—'কর্ম্মযোগ' রচনা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে—ইহা জানিতে চাহিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্য সুরসিক অশ্বিনীকুমার পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলেন—'আমার 'কর্ম্ম-ভোগ' আর এই মর-ধামে থাকিতে কি প্রকারে শেষ হইবে?' কর্ম্মযোগের ভূমিকায় পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও লিখিয়াছেন—সঙ্কল্পিত ধারা অনুসারে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে বৃহদায়ত হইত কিন্তু গ্রন্থকারের রোগজীর্ণ দেহ হইতে সে সঙ্কল্প-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অগত্যা এই পুস্তকে কর্ম্মযোগের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার স্থূল স্থূল বক্তব্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হইল।

গ্রন্থকার এবং ভূমিকা-লেখক দুই জনেই গ্রন্থখানি অসমাপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মযোগ-সম্বন্ধে বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম্মের যে মহোচ্চ আদর্শ অর্জ্জুনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে ভারতীয় ও বিদেশীয় সকল শাস্ত্র হইতে যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সেই কর্ম্মযোগেরই বিবৃতি করিয়াছেন। কর্ম্মযোগে অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন :—

এই সংসার কর্ম্মভূমি। স্বয়ং ভগবান্ মহাকর্ম্মী। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডগৃহের মহাগৃহস্থ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বব্যাপী এই মহাপরিবারের যাহার যাহা প্রয়োজনীয় তিনি তাহা যথাযথরূপে নিত্যকাল যোগাইতেছেন। কর্ম্ম ভিন্ন এই সংসারে কাহারও তিষ্ঠিবার সাধ্য নাই। আত্মরক্ষা ও জগৎ রক্ষার জন্য সকলেই কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণায়মান। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের অন্য পন্থা নাই। জাতীয় উত্থান-পতন কর্ম্ম নিরপেক্ষ হইতে পারে না। ভারতবর্ষ যখন নিষ্কাম কর্ম্মের উচ্চ আদর্শ বিস্মৃত হইল তখনই এই দেশের অধোগতি আরম্ভ হইল। কর্ম্ম অন্তর্ম্মুখ করিয়া লইলে উহার দ্বারা যেমন বাহিরের মঙ্গল সাধিত হয় তেমন ভিতরের মঙ্গলও সংসাধিত হইয়া থাকে, কর্ম্মকুণ্ঠ অকাল সন্ন্যাসী ও কর্ম্মাসক্ত ঘোর বিষয়ী কাহারও ইহা ধারণার বিষয় রহিল না।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ। আমাদের জীবনেও এই সচ্চিদানন্দের লীলা চলিতেছে। আমরা যতদিন হৃদয়ে হৃদয়ে এই সচ্চিদানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিব তত দিন 'কর্ম্মযোগ' 'কর্ম্মভোগেই' পর্য্যবসিত হইবে। জগৎ ব্যাপিয়া আংশিকভাবে ক্রমেই যে এই সচ্চিদানন্দেব প্রতিষ্ঠা হইতেছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সিকাগোর সর্ব্বসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমহাসমিতি, হেগের আন্তর্জ্জাতিক বিবাদ-মীমাংসক মধ্যস্থ ধর্ম্মাধিকরণ এবং সার্ব্বভৌমিক জাতীয় মহাসমিতি ইহারই নিদর্শন। কবি যে ভুবন-মিলন (Federation of the World) কল্পনার দিব্য-চক্ষে দেখিয়াছেন তাহা একদিন যে সংঘটিত হইবে হেগ ধর্ম্মাধিকরণে তাহারই পূর্ব্বাভাস দেখাইতেছে।

মহাভারতে বিদুর বলিয়াছেন—"যাহা সর্ব্বভূতের হিতজনক, আপনার সুখপ্রদ তাহাই করিবে। কর্ত্তার পক্ষে ইহাই সর্ব্বার্থসিদ্ধির মূল।"

দার্শনিক চূড়ামণি ক্যাণ্ট সাহেবও ঐ কথাই বলিতেছেন— "এমনভাবে কর্ম্ম কর যেন তোমার কর্ম্মের মূলসূত্র বিশ্বগত বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পার।"

সুপ্রসিদ্ধ যোষেফ ম্যাট্‌সিনি কর্ম্মীকে উপদেশ দিয়াছেন— তুমি পরিবার কিংবা দেশের জন্য যে কার্য্য করিতে যাইতেছ তাহার প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি যাহা করিতে যাইতেছি তাহা যদি সকল মনুষ্যই

করিত এবং সকলের জন্যই করা হইত, তদ্দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গল হইত, কি ক্ষতি হইত? যদি তোমার বিবেক বলে ক্ষতি হইত, তাহা হইলে থামিবে, যদি তদ্দ্বারা স্বদেশ কিংবা স্ব-পরিবারের আপাতত কোন লাভও হয় তথাপি থামিবে।”

এই যে কর্ম্মের কথা বলা হইল এস্থলে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা এক, আমার প্রয়োজন ও বিশ্বের প্রয়োজন এক। ইহাকেই বলা যায় বিশ্বব্যাপী যিনি অর্থাৎ বিষ্ণু তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগের এই মূলমন্ত্রই বলিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রীতি-কাম যে কর্ম্ম তাহা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম সংসারে আবদ্ধ করে, অতএব বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর।

কর্ম্মের এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিখিল ভারত কিরূপে রাজসিকতা ও তামসিকতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে এই আশার বাণী শুনাইয়াছেন যে,—“ঋষিগণ, ভক্তগণ এই দেশের অস্থিমজ্জায় সাত্ত্বিক ভাব এমন দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, অদ্যাপি সামান্য কৃষক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিলে সে কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইবে না, পাছে তাহাতে তাহার মনে অহঙ্কার স্থান পায়। এখনও এমন অনেক লোক আছেন যাহারা সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ না পায় তজ্জন্য অতি সঙ্গোপনে দান করেন।

"কর্ত্তার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি,কোন জাতির হিংসাদ্বেষে দগ্ধবুদ্ধি হইয়া আমরা যেন অন্তঃসারশূন্য বাহ্য উন্নতির মোহে মুগ্ধ না হই। আমরা যেন ঋষিনির্দ্দিষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শুভেচ্ছাদ্বারা সমস্ত পৃথিবী আবৃত করি। আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত যাবতীয় উদ্যম, অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টা বিষ্ণুপ্রীতিকাম হউক।"

## প্রেম

বাঙ্গলা ১৩০০ অব্দে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বান্ধব-সমিতিতে অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের নিকট 'প্রেম' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা করেন। অতঃপর ঐ বক্তৃতা তিনটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ছাত্রমণ্ডলীকে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই

আজকাল বাজারে সয়তান প্রেম নাম দিয়া অনিষ্টকর পদার্থ বিক্রয় করিতেছে। যুবকগণ তাহা না বুঝিয়া ক্রয় করিতেছে। প্রেমের নামে কাম, মোহ বিকাইতেছে। প্রকৃত প্রেম জগতের সার, অমূল্য পদার্থ, স্বর্গ হইতে প্রেরিত হয় ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিবার জন্য। স্বয়ং প্রেমস্বরূপ প্রেম প্রেরণ করেন। যেখানে ভগবানে মতি নাই সেখানে প্রেম দাঁড়াইতে পারে না। প্রেমের ভিত্তি ভগবান্। যুবকগণ, অনুসন্ধান করিয়া দেখ তোমাদের ভালবাসার মূলে ভগবান্ আছেন কি না? যাহাকে ভালবাস

তাহার সহিত ভগবানের কথা বলিতে ইচ্ছা করে কি না ? পবিত্রতা সঞ্চয়ের জন্য পরস্পর সাহায্য করিতেছ কি না ?

যে স্থলে পবিত্রতা নাই সেস্থলে ভালবাসা নাই। প্রেম-স্বরূপের সত্তা পবিত্রতাময়। পৃথিবীর কোন কলঙ্ক যে ভালবাসায় লাগিয়াছে সে ভালবাসা কখন ভালবাসা নামের উপযুক্ত নহে। তুমি যাহাকে ভালবাস একবার তাকাইয়া দেখিও, তাহার মুখ দেখিলে ভগবানকে মনে পড়ে কি না ?

প্রেম সম্বন্ধে সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা করিবে। তোমার ভালবাসার পাত্র তোমার আত্মসংযম নষ্ট করে কি না ? কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার ইচ্ছা কমাইয়া দেয় কি না ? তাহার মিলন বা বিরহে প্রাণ বিশেষভাবে চঞ্চল হয় কি না ? তাহাকে লইয়া তরল আমোদ করিতে ইচ্ছা হয় কি না ? তোমাকে যিনি ভালবাসেন তিনি আর কাহাকেও ভালবাসিলে মনে ঈর্ষার উদয় হয় কি না ? যদি দেখ আত্মসংযম নষ্ট হয়, কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাঘাত হয়, তরল আমোদ করিতে ইচ্ছা হয়, ঈর্ষার উদয় হয়, তবে জানিও তোমার এ কলঙ্কিত ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নহে।

প্রেমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম স্বার্থরাহিত্য। প্রেম কখন আপনাকে চিনে না। পরের জন্য সর্ব্বদা উন্মত্ত। স্বার্থপরতা আর প্রেম বিরুদ্ধধর্ম্মা। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানে প্রেম নাই। যত প্রেমের বৃদ্ধি তত স্বার্থপরতার হ্রাস। প্রেমিক প্রেমাস্পদের সুখের জন্য নিজের সুখ ত্যাগ করেন। সামান্য

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ভোগ করিতে হইলেও আগে প্রেমাস্পদের ভোগ চাই, নতুবা প্রেমিক তাহা ভোগ করিবেন না। আর বিষম সঙ্কট সময়ে যখন মরুভূমির মধ্যে পিপাসায় প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, একজন বই দুই জনে পান করিতে পারে না এতটুকু মাত্র জলের সংস্থান হইল, সে স্থলেও প্রেমাস্পদের জীবন রক্ষা পূর্ব্বে, প্রেমিকের পরে। সেই প্রাচীন আখ্যায়িকায় আছে, পিথিয়াস্ বলে, 'ড্যামন, তুমি থাক আমি মরি'। আবার ড্যামন্ বলে, 'না, তা' হবে না আমিই মরিব।' কিছুতেই ড্যামন্ পিথিয়াস্‌কে, আবার পিথিয়াস্ ড্যামন্‌কে মরিতে দিবে না। দুই জনেই নিজের প্রাণ দিয়া বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পাগল। ইহাই প্রেমিকের ছবি।

প্রেম প্রতিদান চায় না, মোহ প্রতিদান চায়।

"দিলে নিলে বদল পেলে
ফুরিয়ে গেল প্রেম পিয়াসা।"

এই বিনিময়ের ভাব তো বণিগ্ বৃত্তি। প্রকৃত প্রেমিক কখনও বণিক্ হইতে পারেন না। তিনি ভালবাসিয়াই সুখী, প্রেমাস্পদের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল নন। "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে"—প্রেমিকের এই ধর্ম্ম।

প্রেমের ব্যাপিত্ব মনে করিলে বড়ই আনন্দ হয়। যিনি বিশ্বব্যাপী তাঁহার খাস্ তহবিলের মাল কি না, তাই প্রেম বিশ্ব গ্রাস করিতে ধাবিত। প্রেমের ক্রমে বিস্তৃতি, ক্রমে

বিস্তৃতি। আজ ভালবাসিলাম একজন, সে আনিল আর একজন, পাইলাম দুইজন, মধুচক্র বাঁধিবার চেষ্টা হইল, ক্রমে আরও দুই একজন আসিল, জমিতে জমিতে কত জমিয়া গেল। একজন, দুইজন, তিন জন, ক্রমে দশ জন, এইরূপে পঞ্চাশ জন, একশত জন, এইরূপে প্রেমাস্পদের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে চলিল। প্রেমের চালনা যত অধিক হইবে প্রেমিক জগৎ ততই অধিক সুন্দর দেখিতে থাকিবেন। ততই অধিক জীবে প্রেম ছড়াইয়া পড়িবে।

ক্রমে সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীময় প্রেম ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অবশেষে মানব-রাজ্য অতিক্রম করিয়া সজীব নির্জ্জীব সমস্ত পদার্থই আয়ত্ত করিয়া ফেলে। তখন জগন্ময় কেবল মধু বর্ষণ হইতে থাকে। প্রকৃত প্রেমিক সত্য সত্যই দেখেন—"দিবাকর সুধাকরে সুধা ক্ষরে, সুধামাখা হয়ে পবন সঞ্চরে, নদী বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে, চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।" এই অবস্থায় যখন পহুঁছিবে তখন আনন্দের সীমা থাকিবে না। তখন যাহা সম্মুখে দেখিবে তাহাই জড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যাইবে।

## দুর্গোৎসব তত্ত্ব

অশ্বিনীকুমারের অপর পুস্তক তিনখানির মত "দুর্গোৎসব তত্ত্বও" তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে প্রণীত। কিন্তু অপর তিন খানি পুস্তকে যেমন অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বজনীন

বিষয় আলোচিত হইয়াছে এই পুস্তকখানিতে সেইরূপ বিষয় আলোচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুর্গোৎসব-কারী হিন্দুজনমণ্ডলীর জন্য লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে অশ্বিনীকুমারের ধর্ম্মবিষয়ক অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া জীবন-চরিত আলোচনার দিক দিয়া এই পুস্তকখানির বিশেষ মূল্য আছে।

হিন্দু-সমাজে অধুনা যে-ভাবে দুর্গোৎসব করা হয় তৎসম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার নিম্নলিখিত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

আজ হিন্দু প্রকৃত দুর্গাপূজা করে কৈ? আমি যতদূর বুঝি, প্রায়ই ত দেখিতে পাই পুতুলের পূজা হইয়া থাকে। হিন্দু সত্য সত্যই পৌত্তলিক হইয়াছে। তাহারা সর্ব্বব্যাপিনীকে, আদ্যাশক্তিকে সামান্য মাটীর পুতুলে পরিণত করিয়াছে। তাহা না হইলে তাঁহার সম্মুখে অশ্লীল গান, সুরাপান, এবং নানা প্রকার কুৎসিত গান করিতে সাহস পায় কে? যিনি শুদ্ধা, অপাপবিদ্ধা তাঁহার পূজা করিতে বসিয়া কে পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারে? তাঁহার সাক্ষাতে পাপ করিতে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? যিনি সর্ব্বব্যাপিনী তাঁহাকে এতদূর সঙ্কোচ করা হয় যে, কোন কোন হিন্দু বলিয়া থাকেন, এই পাঁঠাটি পাষাণময়ী কালী বাড়ীতে দিও, চামার পটীর কালী বাড়ীতে দিও না, যেন কালী পাষাণময়ী কালী বাড়ীতে আছেন, চামার পটীতে নাই। আমাদের

সঙ্কীর্ণতা আরোপ করিতে করিতে ভগবানকে এত খর্ব্ব করা হইয়াছে যে, আপনারা শুনিলে অবাক্ হইবেন, কোন ব্যক্তি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া তামাক সাজাইয়া একটি হুকা লইয়া তাহার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন, পরে তাঁহাকে পায়খানায় নিয়া বসাইতেন, তারপর তাঁহার মুখ প্রক্ষালন ও অঙ্গার চূর্ণাদিদ্বারা দন্ত ধাবনাদি করিয়া দিতেন। আবার কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়, শীতকালে ঠাকুরের কাপড়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত, বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে কাপড় না দিলে শীতে কষ্ট পাইবেন। হায়, হায়, যেন একখানি বালাপোষ না পাইলে ভগবান্ যিনি, তিনি আমাদের ন্যায় শীতে কষ্ট পান। যিনি পরাৎপর, পরব্রহ্ম, ত্রিভুবনেশ্বর, যাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া শীত গ্রীষ্ম ঋতুচক্র ঘুরিতেছে, সেই জগদীশ্বর নাকি শীতে কাঁপিতে থাকেন। হায়, কি বিড়ম্বনা। ইহাদ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে? আর্য্য সন্তানগণ ভগবৎ পূজা ছাড়িয়া নিতান্ত সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন।

পূজা করিতেছি অথচ মিথ্যাকথা কহিতেছি, পরের অপকার করিতেছি, ইন্দ্রিয় লালসায় প্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছি, হিন্দু মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা বলুন এই ভাবে পূজা করিলে পূজা হয় কি না? প্রকৃত পূজা করিতে করিতে উপাস্য দেবতার ভাব পূজকে সঞ্চারিত হইবেই হইবে। আমাদের দেশে তাহা কি হইতেছে? যে শক্তি পূজা লোককে শক্তিমান্ করিবার জন্য, সেই শক্তিপূজা

করিয়া এই দেশের কোটী কোটী প্রাণী নিতান্ত নির্জীবের মত অবস্থায় মূষিকের ন্যায়, পিপীলিকার ন্যায় কালাতিপাত করিতেছে। ইহার নাম কি পূজা? এখন কেবল বাহিরে ঢাকঢোলের বাজনা, বলিদানের ঘটা, ডাকের গয়নার সজ্জা, আর কিছুই নয়। প্রকৃত শক্তিপূজা এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার নিম্নলিখিতরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

আমার একটি বিশ্বাস আছে, মূর্ত্তি কি সাকার পদার্থের পূজা কোন কোন লোকের মধ্যে আপনাআপনি আসিয়া পড়ে। খৃষ্টানদিগের ত মূর্ত্তিপূজার বিধান নাই, তথাপি রোমান-ক্যাথলিক দলে খৃষ্ট ও তাঁহার মাতার মূর্ত্তিপূজা হইয়া থাকে। শিখধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজা নিষেধ, তথাপি শিখগণ কি করিতেছেন? তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে গুরুপ্রণীত গ্রন্থের পূজা হইয়া থাকে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ত সাকার পূজার বিরোধী ছিলেন, এখন শুনিতে পাই, তাঁহার কোন কোন অনুচর না কি তাঁহার উত্তরীয় ও পাদুকা পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। স্থূলবুদ্ধি মনুষ্য একটা কিছু সাকার না পাইলে কিছুই ধারণা করিতে পারে না। এমন অনেক লোক আছেন, তাহাদিগকে ঈশ্বর নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, চিন্ময় বলিলে তাঁহাকে শূন্য বলিয়া মনে করেন, নাস্তিকতায় গড়াইয়া পড়েন। এইজন্য বোধ হয় পাশ্চাত্য

সাধারণ লোক অপেক্ষা, এইদেশের সাধারণ লোক সুশীল ও অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মভীরু।

অশ্বিনীকুমার শাস্ত্র-বচন বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—ভগবান্ ও জীব এক হইয়া গিয়াছেন এই ভাব উত্তম, ধ্যান-ভাব মধ্যম,, স্তুতিজপ অধম, বাহ্যপূজা অধমের অধম। কিন্তু অধমের অধম বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিবেন না। ইহার অনেক প্রয়োজন। ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে নির্গুণ ব্রহ্মে পঁহুছা যায়। অল্পবুদ্ধি লোকদিগের জন্য বাহ্যপূজা—নিরাকারার সাকার পূজা আবশ্যক হয়।

স্থূলে মন নিশ্চল হইলে, পরে সূক্ষ্মেও মন নিশ্চল হয়। একটি গল্প প্রচলিত আছে, কোন একটি ছাত্র বেদ পড়িতে গিয়া মন স্থির রাখিতে পারে না দেখিয়া গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন? সে উত্তর করিল, 'আমার একটি প্রিয় মহিষ আছে, আমার মন কেবল সেদিকে ধায়।' গুরু তাহাকে আজ্ঞা করিলেন—'তবে তুমি বেদ ছাড়িয়া মহিষই ভাবিতে থাক।' মহিষটাকে ভাবিতে ভাবিতে যখন মন স্থির হইল, তখন তাহাকে পুনরায় বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, শিষ্য এবার কৃতকার্য্য হইলেন। বাহ্যপূজা প্রভৃতি কেবল মনকে সূক্ষ্মের দিকে লইয়া যাইবার জন্য, রূপ হইতে অরূপে যাইবার জন্য, নাম হইতে নামের উপরে উঠিবার জন্য, কেবল মনটাকে বাঁধিবার জন্য এসব করা হইয়াছে।

ভক্ত তুলসীদাস একটি দোঁহায় বলিয়াছেন, বালিকা যতদিন আপন প্রিয়তম স্বামীর দেখা না পায় ততদিন পুতুল লইয়া খেলা করে। আর যাই স্বামীর সহিত দেখা হইল অমনি সব পুতুল পেটারায় বন্ধ হইল। যতদিন পরমেশ্বরের সহিত দেখা না হয় ততদিন রূপ-নাম লইয়া খেলা, আর যাই ব্রহ্মজ্ঞান হইল খেলাও শেষ। কেবল যে রূপই কল্পনা তাহা নয়, ব্রহ্ম বলুন, আল্লা অথবা আর যাই বলুন সমস্তই কল্পনা। সুতরাং রূপ ও নাম এই দুইয়ের শেষ হবে যখন, মুক্তি হবে তখন।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন ঃ—

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও মন কি তা জান না?
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তাঁর
কর্‌তে চাওরে উপাসনা।

আরও গাইয়াছেন,

ত্যজিব সব ভেদাভেদ
ঘুচে যাবে মনের খেদ
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।

দেখুন ভক্ত রামপ্রসাদ কোথা হইতে কোথায় উঠিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই বৃদ্ধেরাও পাঠশালায় রহিয়া গেলেন। উপরে আর উঠিতে পারিলেন না। উঠিবেন কি করিয়া? এই দুর্গাপূজা আসিতেছে, কেহ কি

চিন্তা করেন দুর্গাপূজা কি? তাহা অনুসন্ধান করিলে তবে ত উন্নতি হইবে। নতুবা 'ক-খ'তেই আরম্ভ 'ক-খ'তেই শেষ।

দুর্গাপূজার মন্ত্রার্থ এবং প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া অশ্বিনীকুমার দেশ প্রচলিত পূজা-পদ্ধতির একটি বিশেষ দৌর্ব্বল্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

এখন পূজা করিবে কে? যে শাস্ত্রে পূজার বিধি রহিয়াছে সেই শাস্ত্রই বলিতেছেন—"স্বয়মসমর্থে ব্রাহ্মণং বৃণুয়াৎ" নিজে না পারিলে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করিবে। কিন্তু এই নিয়ম অনুসারে কি কেহ কার্য্য করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতির প্রায় কেহই নিজে পূজা করেন না। ব্রাহ্মণেরাই বা কয়জনে করিয়া থাকেন? ভগবানকে ডাকিতে হইলে কি মোক্তারদ্বারা ডাকিতে হইবে? চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হইতেছে, ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়িতেছেন, আমি ততক্ষণ ঘরে বসিয়া প্রজার বাজে জমা আদায় করিতেছি কিংবা 'কবি' গানের বন্দোবস্ত করিতেছি। এই ভাবে পূজা করিলে কি ফল হইতে পারে? এ দিকে যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি হয়ত উষ্ট্র স্থলে একবার বলিতেছেন উষ্ঠ, আবার বলিতেছেন উট্র এবং সতৃষ্ণ নয়নে এক একবার নৈবেদ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কি অপূর্ব্ব পূজাই হইতেছে!! নিজে যদি পূজা করিতে না পার, তবে ব্রাহ্মণ ডাক। কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইয়া যাহাতে মনে ভক্তির সঞ্চার হয় তাহা করা দরকার। যদি

আমমোক্তার কি উকীল নিযুক্ত করিতে হয়, তবে সচ্চরিত্র, শুদ্ধ, শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ যেন নিয়োগ করা হয়। আমরা যে উকীল কি আমমোক্তার দিয়া পূজা করাইয়া থাকি তাহারা প্রায়ই মোকদ্দমা নষ্ট ও তহবিল তশ্রুপ করিয়া থাকেন।

# সপ্তম অধ্যায়

## ভক্ত অশ্বিনীকুমার

ভক্তির কথা শুনিলে অশ্বিনীকুমারের হৃদয় নাচিয়া উঠিত। ভক্তচরিতকথা কীর্ত্তনে তিনি যেন সহস্রজিহ্ব হইতেন। তিনি যখন ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন তখন ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার মুখের শুচিশোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইত এবং নয়নদ্বয় জ্বল্ জ্বল্ করিত। সভাস্থলে অশ্বিনীকুমার যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন তখন বিস্মিত শ্রোতৃমণ্ডলী অনন্যমনা হইয়া তাঁহার বচনসুধা পান করিতেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বাক্যে শত শত বালবৃদ্ধ-যুবকের হৃদয়ে যথার্থ ধর্ম্মভাব জাগরিত হইত। অনেকের জীবনগতি পুণ্যালোকের অভিমুখে প্রবাহিত হইত।

ভক্তির সুবিমল আলোকে বাল্যাবধি অশ্বিনীকুমারের হৃদয় আলোকিত ছিল, তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতঃই অহৈতুকী ভক্তির অঙ্কুর ছিল। এই হিসাবে তাঁহাকে পরমেশ্বরের অনুগৃহীত কিংবা পরম ভাগ্যবান্ বলা যায়। পঠদ্দশায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সংশ্রবে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরক্তি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি যশোহর নগরে যে ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মসভার বিশেষত্ব তথাকার বালবৃদ্ধযুবক সকলের

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্মসভায় হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের ধর্ম্মোপদেশ প্রচারের অধিকার ছিল। কিশোর বয়স্ক অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম্মসভায় যখন ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন তখন বহু প্রবীণ ও নবীন ব্যক্তি নয়নজলে সিক্ত হইয়া সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেন।

বরিশালে আগমন করিবার পরে অশ্বিনীকুমার তথাকার ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে তিনি নিয়মিতরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। Rejoicings of the Bramho Samaj এবং Silver wedding of the East and the West এই দুই প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দ্বারা তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ সুপরিচিত হইয়াছিলেন। বরিশালে ধর্ম্মান্দোলন, সমাজসংস্কার ও মাদকতানিবারণের প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি এমন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল সরকারের মত মনীষী ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, What Keshab Chandra Sen was at Calcutta Asvini Kumar Datta is at Barisal—"কলিকাতায় ব্রহ্মানন্দ কেশব যাহা ছিলেন, বরিশালে অশ্বিনীকুমার তাহাই।" বস্তুতঃ বরিশালে সেই যুগে অশ্বিনীকুমার শিক্ষা, সুনীতি ও ধর্ম্মান্দোলনের পবিত্র অগ্নি জ্বালাইয়া শত শত লোককে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন ইহা ধ্রুব সত্য।

অশ্বিনীকুমার আপনাকে পরমহংসদেব, কেশবচন্দ্র ও বিজয়-কৃষ্ণের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেন।

সংসারে অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা দেখা যায় না। ভগবত্তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আন্তরিক ব্যাকুলতা হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজনেরও আছে কি না সন্দেহ। এই আশ্চর্য্যসুন্দর জগৎ কে সৃষ্টি কবিয়াছেন? তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি? এইরূপ প্রশ্ন আমরা পরস্পরকে কদাচিৎ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা হইলে আমরা সাধারণতঃ জিজ্ঞাসা করি—"আপনি কেমন আছেন? আপনার পরিবার কেমন আছেন? কাজকর্ম্ম, ব্যবসায়বাণিজ্য কেমন চলিতেছে? ইত্যাদি। বস্তুতঃ একটু চিন্তা করিলেই আমরা ইহা দেখিতে পাই যে, আমাদের মন আহারবিহার, আলুপটল, টাকাকড়ি এই সমস্ত ছোট ছোট সাংসারিকতার মধ্যে জড়িত হইয়াই প্রায় সর্ব্বদা থাকে। মন অতি অল্প সময়েই এই সকলের উপর উঠিয়া থাকে।

অশ্বিনীকুমার সংসারী ছিলেন: জমাজমি, টাকাকড়ি, দেনাপাওনা, খাওয়াপরা এই সকল কথা তাঁহাকে ভাবিতে হইত। কিন্তু তিনি এমন বড় মন লইয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন যে, এই সকল বিষয় তাঁহার মনকে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে পারিত না। তিনি বৈষয়িক

মামলা মোকদ্দমার নথিপত্র দেখিতেন বলিয়া তাঁহার কোন দিন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও ধর্ম্মালোচনায় অবসরের অভাব হইত না। তাঁহার ধর্ম্মপিপাসু মন প্রত্যহই সাংসারিকতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া পরমসুখদ ব্রহ্মানন্দের বিমলবায়ুতে বিহার করিত। যিনি রসস্বরূপ তাঁহার সহিত অশ্বিনীকুমারের নিত্য বিহার হইত বলিয়া তিনি আমরণ সদাপ্রসন্ন, সুরসিক ও শিশুস্বভাব ছিলেন।

অশ্বিনীকুমার সংসারী ছিলেন। সংসার ও ধর্ম্মের সমন্বয় তাঁহার জীবনে দৃষ্ট হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—"সংসারী কেন ভক্ত হইতে পারিবে না, এ সংসার কি ভগবানের সৃষ্ট নয়? ইহা কি সয়তানের রাজ্য? ভগবান্ যখন মাতাপিতা দিয়াছেন, গৃহপরিবার দিয়াছেন, তখন তাঁহার চরণে প্রাণ অর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সংসারের সমস্ত কার্য্য তাঁহার কার্য্য করিতেছি বলিয়া করিলে পাপস্পর্শ করিতে পারিবে না। প্রাণও সর্ব্বদা অমৃতপূর্ণ থাকিবে। যতই কেন সংসারের কার্য্য না করি, প্রাণের টান সর্ব্বদা তাঁহার দিকে থাকা চাই। যেমন নটী সঙ্গীত, বাদ্য ও কত প্রকার তান লয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কত ভাবভঙ্গীতে নৃত্য করিবার সময়েও মস্তকস্থিত কুম্ভকে স্থিরভাবে রক্ষা করে, তেমনি যে ব্যক্তি ধীর তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয় উপভোগ করিলেও মুকুন্দ-পদারবিন্দ ত্যাগ করিবেন না, সর্ব্বদা সেই চরণে তাঁহার মতি স্থির থাকে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ানুপ্রসেবমানো
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্।
সঙ্গীতবাদ্যকতিতানবংশগতাপি
মৌলিস্থকুম্ভ পরিরক্ষণধীর্নটীব ॥

অশ্বিনীকুমার সংসারী হইয়াও ভক্তের মত শ্রীভগবানে মতি স্থির রাখিয়াছিলেন, তিনি সংসারের সমস্ত কার্য্য পরমেশ্বরকে লইয়া করিতেন। এইজন্য তিনি জীবনে কদাচ হা হতোস্মি করেন নাই। তিনি রসস্বরূপ দেবতার ভক্ত ছিলেন বলিয়া বহুবৎসরব্যাপী রোগভোগ করিয়াও আমরণ চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। আনন্দময় মধুর হাস্য তাঁহার স্বভাব সুন্দর মুখের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিত। তাঁহার সেই হাসিমাখা মুখ মনে পড়িলে কবির কণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হয়।

অমনি সোণার মুখ আমি বড় ভালবাসি।
মলিনতা লেশ নাই কথায় কথায় হাসি ॥

ঈশ্বরপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার পরম কৌতুকী ছিলেন। বন্ধুবান্ধবে বেষ্টিত হইয়া অশ্বিনীকুমার যে স্থানে বিরাজ করিতেন ঠাট্টাতামাসা ও হাসির লহরে সেই স্থান মুখরিত হইয়া উঠিত। তাঁহার চরিত্র সমুদ্রের মত, তাঁহার বক্ষে নিরন্তর আনন্দের ঢেউ খেলিত। তিনি বলিয়াছেন—"ভগবান্ বড় কৌতুকী, তাহা না হইলে বনে এত ফুল ফোটে, সাজের বেলা আকাশে এত রং ফলে, এমন মধুর দক্ষিণে হাওয়া বয়।"

যথার্থ প্রেমের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"প্রেমের ভিতরে হাসি আছে, আমোদ আছে, ঠাট্টা আছে, কিন্তু তরলতা নাই। ফুলের বাহিরে পাপড়িগুলি কেমন ঢুলিয়া ঢুলিয়া হাসে কিন্তু ভিতরে অন্তঃস্থলে একটি সুন্দর কালো দাগ। তেমনি প্রেমিকের বাহিরে কৌতুক খেলা, কিন্তু সেই কৌতুকের কেন্দ্রভূমি "গাম্ভীর্য্য।" প্রেমিক অশ্বিনীকুমার এই প্রেমগিরি কন্দরে যোগী হইয়া নিরন্তর আনন্দনির্ঝরধারা পান করিতেন। তিনি গাহিয়াছেন—

প্রেমগিরিকন্দরে যোগী হয়ে রহিব।
আনন্দনির্ঝরপাশে যোগধ্যানে বসিব॥
সে আনন্দপ্রস্রবণে, পুণ্যচন্দ্রমাকিরণে
মোহন মাধুরী খেলা প্রাণভরে হেরিব।
মিটাতে বিরহ-তৃষা, কূপজলে আর যাব না
হৃদয়করঙ্গ পূরি, শান্তিবারি তুলিব।
তত্ত্বফল আহরিয়ে, জ্ঞানক্ষুধা নিবারিয়ে
বৈরাগ্য বনকুসুমে শ্রীপাদপদ্ম পূজিব।
'কভু' বসি ভাবশৃঙ্গ'পরে পদামৃত পান করে
হাসিব কাঁদিব আবার নাচিব আর গাইব।

প্রেমযোগী অশ্বিনীকুমার তাঁহার উপলব্ধ এই আনন্দানুভূতি নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"যিনি নির্জ্জনে একটু স্থির হইতে শিখিয়াছেন, তিনিই জানেন সে সময়ে আমরা আমাদিগের স্বীয় শরীর ও চতুষ্পার্শস্থ জগৎ একেবারে ভুলিয়া

যাইতে পারি। কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া বসিলে প্রথমে বাহ্যজগৎ, পরে আপনার হস্ত, পদ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ দূর হইতে থাকে, তৎপরে ধীরে ধীরে চিন্তাপ্রবাহ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হয়, দ্বৈত চলিয়া যায়, আত্মপর থাকে না। সমস্ত ভুলিয়া গেলে একটি, অনির্ব্বচনীয় ভাবের আগমন হয়। যিনি এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন তিনি যদি তখন বিদেহ না হইয়া আপনার ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন তাহা হইলে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতেন—এ জগৎ কোথায় গেল, কে সরাইয়া নিল, কোথায় লয় প্রাপ্ত হইল, আমি ত এইমাত্র দেখিতেছিলাম। এখন ত আর নাই। কি মহাশ্চর্য্য ব্যাপার!"

অশ্বিনীকুমার তাহার এই অত্যাশ্চর্য্য আনন্দানুভূতির কথা অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন—"আনন্দে সব একাকার হইয়াছে। বাস্তবিকই এইরূপ ভাবাবেশের সময়ে আনন্দপ্লাবনে, শরীর, মন, বুদ্ধি, চরাচর বিশ্ব সমস্ত ডুবিয়া যায়, তাহার তুলনা এ জগতে কোথায়? আবার যখন শরীরের মনের অস্তিত্ব জ্ঞান হইতে থাকে তখন কষ্ট হয়, হাতখানি, পাখানি, নাড়িতে ইচ্ছা হয় না। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ মুক্তাকাশে বিচরণ করিয়া যেমন পুনরায় পিঞ্জরে প্রবেশ করিতে কষ্ট বোধ করে তেমনি কষ্ট বোধ হয়।"

যিনি 'রসোবৈ সঃ' তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে এই বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এই কথা হাজার

হাজার লোক শুনিয়াছেন, শত শত লোক ধর্ম্মগ্রন্থে ইহা পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু হাজারের মধ্যে এক ব্যক্তিরও এই তত্ত্ব জীবনে আয়ত্ত হয় কি না সন্দেহ। যাঁহারা ঋষি, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারাই বিশ্বের সকল পাত্র হইতে আনন্দমদিরাধারা পান করিতে পারেন। এই বিশ্বসংসারের আনন্দ যজ্ঞে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন কেবল ভক্ত ও ঋষিগণ। ভক্ত অশ্বিনীকুমার আনন্দময় পরমদেবতার 'সনদ' লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন বলিয়া, হাসিয়া খেলিয়া বিশ্বের আনন্দধারা পান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

আমি তোর মুখফুলানো ভগবানের ধার ধারি না ভাই
আমার ঠাকুর হাসি, খুসি, খেলাধূলোয় পাগল দেখ্‌তে পাই।

যেমন হাসি উঠল ফুটে
চৌদ্দ ভুবন এল ছুটে
সৃষ্টি হোল, সারা প'ল সবাই ধর্‌লে তাই।
তাই তাই তাই চল্‌ল ভেসে
ঠাকুর খুন হেসে হেসে
হাসির তরঙ্গ কত বলিহারি যাই।

প্রেমে সৃষ্টি গরগর
কাঁপে ভাবে থরথর
তান ধর্‌লো ঠাকুর আমার নাচিল সবাই।

(আবার) যাই ফুরালো বাইরের খেলা
ভেঙ্গে গেল মহামেলা
ঐ হাসিতে ডুবে গেল সারাশব্দ নাই।
এই মজা ভাই দেখে দেখে
আমিও ভাই থেকে থেকে
সবার সঙ্গে মিলে মিশে হাসি নাচি গাই।
যখন আস্‌বে সময় যাবে বেলা
ফুরাবে এই ভবের খেলা
ডুবে যাব হাসির মাঝে ধিন্‌ ধিন্‌ ধিন্‌ তাই তাই।
যারা মুখ ফুলিয়ে থাকে ভবে
তাদের বহুৎ দেরী হবে
সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পন্থা নাই।

আনন্দের উপাসক অশ্বিনীকুমার তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অতি মনোহর ছবি উক্ত সরল সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"বইএর কথা না লিখিয়া আমার অনুভূতির কথা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছ। আমার কি তেমন কপাল যে তাহা লিখিতে পারি, তবে কখনও কদাচিৎ যে কিছু অনুভব না করিয়াছি, তাহাই বা বলি কি প্রকারে। একদিন জেলে যখন ছিলাম আনন্দ পাইয়া পাগলের মত যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা তোমাকে পাঠাইতে আমার সঙ্কোচ নাই,

উহাতে রস, মাধুর্য্য, লালিত্য কিছুই নাই; তবে মোদ্দা কথাটা আছে, সভ্যসমাজে উহা উপস্থিত করিও না, তুমি দেখিও। আমাকে ভালবাস বলিয়া তোমার কাছে মন্দ লাগিবে না। একটি গান লিখিয়াছিলাম, সে গানটি এই—

পিলু-যৎ

ইনি যখন দয়া করেন, কি যে তখন হয়ে যাই।
কারে কব সে সব কথা, শুন্‌লে পাগল বল্‌বে ভাই॥
চাঁদ এসে কোলে পড়ে
প্রাণে মধুনির্ঝর ঝরে
হীরামাণিক থরে থরে
হৃদয়মাঝে দেখিতে পাই।
যারে দেখি সেই মিষ্টি
সবাই করে সুধাবৃষ্টি
ঘুচে যায় তার ইষ্টিরিষ্টি
শত্তুর মিত্তির ভেদ নাই।
কি যেন পিয়ে পিয়ে
ভাবে হয় বিভোল হিয়ে
ধূলো মুঠো হাতে নিয়ে
শত শত চুমো খাই।

বাস্তবিকই বড় সুখ হয়, বড় সুখ হয়। খুব স্ফূর্ত্তিতে থাক্‌বে, আছইত। আবার আমি তা তোমাকে বলে দেব।

আশীর্ব্বাদ করি দেবভোগ্য আয়ু লাভ করিয়া আয়ুষ্মান হও ও চিরদিন মধুমাস রসাক্রান্ত বৃক্ষবন্মুদিতো ভব। আশীর্ব্বাদ করি—

জপোজল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনম্
গতি প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনদ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা
সপর্য্যাপর্য্যায়স্তস্তভবতু যত্তে বিলসিতম্॥

তোমার সমস্ত জল্পনা তাঁহার জপ হউক, যত গঠনাদি ক্রিয়া পূজার সময়ের মুদ্রাবিচরণরূপে প্রতিভাত হউক, তোমার গমনভ্রমণ মাত্রেই তাঁহার প্রদক্ষিণরূপে পরিণত হউক, আহারাদি তাঁহাকে আহুতি দেওয়া হইতেছে এই জ্ঞান হউক, শয়ন যেন তাঁহার চরণে প্রণাম বলিয়া গণ্য হয়, তাঁহাতে আত্মনিবেদন যেন তোমার সকল সুখ এবং তোমার যাহা কিছু ক্রীড়া, চেষ্টা সকলই যেন তাঁহার পূজার ক্রম বলিয়া গৃহীত হয়।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার কি প্রকারে তাঁহার প্রিয়তম দেবতাকে অহর্নিশ সকল কার্য্যের মধ্যে অনুভব করিয়া থাকেন উক্ত পত্রে তাঁহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ সেন্ট্রাল জেল হইতে ইংরাজি ভাষায় আর একখানি পত্রে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয়কে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই ঃ—গতকল্য আমি তোমার পত্রে মাঘোৎসবের শ্রদ্ধাপূর্ণ সাদর অভিবাদন পাইয়াছি। তুমি

আমার আন্তরিক স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। এখানে আমি আমার স্নেহশীল বন্ধুদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছি সত্য, কিন্তু যিনি মাঘোৎসবের রাজা তিনি এখানেও আছেন, আমি তাঁহার সঙ্গে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি।

তুমি জান শ্রীমদ্ভাগবত আমার পরম আনন্দের সামগ্রী। ঐ পুস্তক আমার আছে। তদ্‌ভিন্ন তুলসীদাসের রামায়ণ এবং কোরাণের অনুবাদ পুস্তকও পাইয়াছি। তুলসী দাসের রামায়ণ হইতে একটি অতি উত্তম শ্লোক তোমাকে উপহার দিতেছি—

কামিহিঁ নারী পিয়ারি জিমি
লোভিহিঁ প্রিয় জিমি দাম
তিমি রঘুনাথ নিরন্তর
প্রিয় লাগহু মোহিঁ রাম।

যেমন কামীর (প্রেমিকের) নিকট (প্রেমাস্পদ) নারী প্রিয়, লোভীর নিকট যেমন টাকা পয়সা, তেমনি রাম রঘুনাথ নিরন্তর আমার নিকট প্রিয় হন্।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন—কারাগারে আনন্দময় দেবতার সঙ্গসুখ হইতে তিনি বঞ্চিত নহেন, যে শ্রীমদভাগবত তাঁহার প্রাণপ্রিয় গ্রন্থ কারাগারে উক্ত গ্রন্থ তাঁহাকে আনন্দ দান করিত, ভক্ত তুলসী দাসের রামায়ণ তাঁহার নিকট আনন্দের প্রস্রবণ ছিল। বস্তুতঃ ভক্তিযোগ-বক্তা অশ্বিনীকুমারের জীবন আলোচনা করিলে ইহাই দেখা যাইতে

পারে যে, তাঁহার জীবনই জীবন্ত ভক্তিগ্রন্থ ছিল। প্রকৃত ভক্তের যাহা লক্ষণ সমস্তই তাঁহার জীবনে প্রকটিত হইয়াছিল।

যাহারা ভগবচ্চিন্তাবিমুখ সাধুরা কদাচ এমন ব্যক্তির সঙ্গ করিতে ভালবাসেন না। ভক্ত অশ্বিনীকুমার কাহাদের সঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন? যাহারা অশ্বিনীকুমারের বরিশাল নগরস্থ বাসভবন দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার বাসগৃহ সাধু সজ্জনের মিলনভূমি ছিল। সে গৃহ দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় পুণ্যপ্রসঙ্গে ও নামগানে মুখরিত থাকিত। নানা দিগ্‌দেশ হইতে যত সাধু বরিশাল নগরে গমন করিতেন তাঁহাদের আশ্রয় ছিল অশ্বিনীকুমারের গৃহ। ভক্ত অশ্বিনীকুমারকে দর্শন করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন। অশ্বিনীকুমারও তাঁহাদের সহিত ভাগবত প্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন।

সূর্য্যরশ্মির মত সৎসঙ্গ মানুষের হৃদয়ের তাবৎ অন্ধকার দূর করিয়া থাকে। এইজন্য যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত ও সাধু সজ্জনের সঙ্গ করিবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া থাকেন।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার জীবদ্দশায় কত সাধুমহাজনের সঙ্গ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। তিনি ভারতবর্ষের সকল অঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং যেখানে গিয়াছেন সেখানে বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যে-কোন

সাধুসন্ন্যাসী থাকিতেন সেই সাধুকে তিনি দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সাধুসন্ন্যাসী-দর্শন ও তাঁহাদের সহিত আলাপ করা তাঁহার নেশার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার বলিতেন—"যিনি প্রাণের সহিত ভগবৎকথা বলেন, আমাদিগের তাঁহারই চরণধূলি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পাইব। "সঙ্গগুণে রং ধরিবেই নিশ্চয়।"

ভক্ত অশ্বিনীকুমার কাশীর ভাস্করানন্দস্বামী, বৃন্দাবনের রামদাস কাঠিয়া বাবা, নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজী, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, বিবেকানন্দ, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি সাধুমহাত্মাদের পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়াছেন। ভাস্করানন্দস্বামী অশ্বিনীকুমারকে প্রথম দর্শন কালে বলিয়াছিলেন—"আভি তো প্রেমকা সুরু হুয়া, ইস্‌কো দৃঢ় কর্‌নে হোগা।" অশ্বিনীকুমার এইসকল সাধুমহাত্মাদের কাঁহারও, কাঁহারও বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। রূপকথার রাজপুত্রেরা যেমন সোণারূপা কাঠি ছোঁয়াইয়া মৃতা রাজকুমারীর দেহে জীবন-সঞ্চার করে, যথার্থ ভাগবত ব্যক্তিরা সেইরূপ তাঁহাদের পুণ্যস্পর্শে জিজ্ঞাসু ধর্ম্মার্থীদের প্রাণে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিতে পারেন। সাধুসজ্জনদের পবিত্র সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের অন্তরস্থ স্বাভাবিক ধর্ম্মপিপাসা শতধা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভাগবত ভাবই তাঁহার জীবনকে

মধুময় ও পরম আকর্ষণের সামগ্রী করিয়াছিল। ইহারই আকর্ষণে শত শত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতেন। অশ্বিনীকুমার একবার দেওঘরে মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারকে দেখিবামাত্র বসু মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—'কে অশ্বিনী, উঃ কি আনন্দ।' এই বলিতে বলিতে তিনি ভক্তিমান্ অশ্বিনীকুমারকে জড়াইয়া ধরিলেন। অশ্বিনীকুমারের পরম স্নেহাস্পদ সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন মহাশয় তাঁহার স্মৃতিসভায় বলিয়াছেন— "একদিন দেখিলাম নগ্নদেহ, নগ্নপদ, রুক্ষকেশ, মলিনবসন, জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধ তাঁর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। কোনরূপ অভিবাদনাদি না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম অশ্বিনী দত্ত". তিনি বলিলেন "হুঁ", বৃদ্ধ বলিল—তুমি বসিয়া থাক আমি একটু দেখি, বলিয়াই টস্ টস্ করিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল, আমরা হাসিলাম। বৃদ্ধ অনেক দুঃখে বলিল— 'বাবুরা আমাকে ইতিহাস করে।' অশ্বিনীকুমার অমনি উঠিয়া সেই কৃষিজীবী নমঃশূদ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার তক্তপোষের এক পার্শ্বে বসাইলেন।" বরিশালের শত শত বালবৃদ্ধযুবক অশ্বিনীকুমারকে দেখিবার জন্য আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করিত। তাহারা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে অবসর করিয়া একটিবার এই সদাপ্রসন্ন ভক্তের হাস্যসুন্দর মুখখানি দেখিয়া যাইত। এমন কি তথাকার

বৃদ্ধ ব্যবহারাজীবী প্রভৃত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী প্যারিলাল রায় ও দীনবন্ধু সেন মহাশয় তিন চারি দিন অশ্বিনীকুমারকে দেখিতে না পাইলে ছুটিয়া আসিতেন আর কৈফিয়ত চাহিতেন—"কেন এতদিন দেখি নাই।"

কেহ কেহ মনে করেন—এই যুগে সাধুভক্তের একান্ত অভাব। এখন ঘোরকলি, লোকের মন হইতে ধর্ম্মভাব চলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ একথা শ্রদ্ধেয় নহে। অশ্বিনীকুমার বলিতেন—"আমার কিন্তু মনে হয় যে জীবনে উচ্চভাব দেখাইয়াছেন, এরূপ মহাত্মা একটু অন্বেষণ করিলেই এখনও পাওয়া যায়। সাধুর যে বিশেষ অভাব আছে আমি তাহা মনে করি না, তবে আমাদিগের তাঁহাদের চরণ দর্শনের ইচ্ছার বিশেষ অভাব আছে, স্বীকার করি। সাধুগণ প্রায় সর্ব্বত্রই আগমন করিয়া থাকেন। যিনি তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি দেখিতে পান।"

সাধুদর্শনের আকাঙ্ক্ষা অশ্বিনীকুমারের অন্তরে কি প্রবল ছিল ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যেসকল সুপ্রসিদ্ধ সাধুভক্তের সঙ্গ তিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কয়েকজনেব নাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অশ্বিনীকুমার প্রেমের অঞ্জন পরিয়া এই বিশ্বসংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন বলিয়া তাঁহার চক্ষে বহু অখ্যাত ব্যক্তির ভাগবত ভাব উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইত। তিনি তাঁহার এক প্রতিবেশীর ভাগবত ভাবের যে চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"আমাদের গ্রামে রামকৃষ্ণ নামে এক রজকবিপ্র ছিলেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে স্থাপিত রাজরাজেশ্বর নামে এক কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা করিতেন; ইহারই সেবা করিতে করিতে ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। একদিন পূর্ব্বাহ্ণ দশ কি এগার ঘটিকার সময়ে রামকৃষ্ণের বাড়ী বড়ই জাঁকাল সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মনে করিলাম, আজ রামকৃষ্ণের বাড়ী বিশেষ কোন উৎসব আছে। বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম তাহা কখনও ভুলিব না। গিয়া দেখি রামকৃষ্ণের অল্পবয়স্ক এক পৌত্রী রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে মৃত্তিকায় শয়ান, তাহাকে ঘিরিয়া এবং রাজরাজেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া কতগুলি লোক প্রাণ ঢালিয়া উচ্চরবে কীর্ত্তন করিতেছে। রামকৃষ্ণের দুইচক্ষে অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতেছে, তিনি একএকবার কীর্ত্তন করিতেছেন, এক একবার মেয়েটীকে রাজরাজেশ্বরের প্রসাদ খাওয়াইতেছেন ও এক একবার অনিমেষ নয়নে রাজরাজেশ্বরের দিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছেন, দোহাই রাজরাজেশ্বরের, নিতে হয়, এখনই নেও এখন এস্থল বৃন্দাবন, এখন তোমার নাম কীর্ত্তন হইতেছে এখনত এস্থল বৃন্দাবন, নিতে হয় এই কীর্ত্তন থামিবার পূর্ব্বে নেও, আর না নিতে হয় রেখে যাও। তোমার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু নিতে হইলে, দোহাই তোমার, এসময়ে নেও, বৃন্দাবন থাকিতে থাকিতে নেও"। মেয়েটি কলেরা রোগাক্রান্ত।

তাহাকে রাজরাজেশ্বরের সম্মুখে শোয়াইয়া প্রসাদ খাওয়াই-তেছেন এবং রাজরাজেশ্বরের দোহাই দিতেছেন দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কীর্ত্তনের পরে কন্যাটিকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। অপরাহ্ণে রামকৃষ্ণ আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিলাম, মেয়েটি আরোগ্য লাভ করিয়াছে।"

আমরা অন্যের গুণ দেখিয়া আনন্দিত না হই এমন নহে, কিন্তু সাধারণতঃ অন্যের দোষগুলিই বেশী করিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। ভক্ত অশ্বিনীকুমার এমন প্রকৃতির ছিলেন যে, তাঁহার চক্ষে অন্যের দোষ অপেক্ষা গুণই বেশী করিয়া পড়িত। অশ্বিনীকুমারের এক ছাত্র ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়নকালে পরলোক গমন করেন। সেই ছাত্রটির নাম হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইহার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে ভাগবত ভাব প্রকটিত হইয়া-ছিল অশ্বিনীকুমারের মুখে তাহা শুনিয়া আমার বিস্মিত হইয়াছিলাম। উক্ত হেরম্বচন্দ্রের জীবনীর ভূমিকায় অশ্বিনী-কুমার লিখিয়াছেন—"হেরম্বের জীবন ও মৃত্যু আলোচনা করিলে মনে হয় তিনি যেন দিব্যধামের যাত্রীদিগকে কি কি সম্বল লইয়া চলিতে হইবে, বহুল পরিমাণে তাহাই দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এই যুবকের জীবনে কোনও ক্ষুদ্র ত্রুটি ছিল না বলিতেছি না। কিন্তু তাঁহার বিনয়মণ্ডিত নিঃসঙ্কোচ তেজ, সরলা সান্দ্রাভক্তি, প্রাণঢালা নরসেবা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মপর্য্যবেক্ষণ সকলই আমাদের অনুকরণীয়!......এমন

তেজ কোথায় পাই যে তেজ ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারে—"আমি অপবিত্র, পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত কি, জ্বলন্ত আগুন, আচ্ছা তুমি আগুনের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাক, আমি ঝাঁপ দিব। উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্র? ডাক, ডুবিব।"………এমন ভক্তি কোথায় পাই যে ভক্তি শারদীয়া জোৎস্না সম্ভোগে উচ্ছ্বসিত হইয়া গাহিল—

হাসি হাসি কেবল হাসি
যে মুখ থেকে আস্‌ছে ভাসি
তারই তরে প্রাণ উদাসী
বার্ হয়েছি দেখ্‌ব বলে।

যে ভক্তি ভগবান্‌কে প্রাণারাম নামে সম্বোধন করিয়া বলিল—"তুমি আমাকে এমন করিয়া ফেলিয়াছ যে তোমাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না।' হেরম্ব তাঁহার মর্ত্ত্যলোকস্থ অল্পপরিসর জীবনের মধ্যেই "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা তাঁহার এমন একটি আকর্ষণী শক্তি জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পরিচিত বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার কথা, গান, আচার ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। অনেক বালক ও যুবকের চরিত্রে তাঁহার 'সঙ্গগুণে রং' ধরিয়াছিল। তিনি যে মণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেন তাহা যেন দিব্য সৌরভে পূর্ণ করিয়া লইতেন। তাঁহার জীবনে যেরূপ, মৃত্যুতেও তেমনি ভাগবত ভাব উদ্ভাসিত হইয়াছিল। যাহা জীবনে

অভ্যস্থ হয় তাহাই মৃত্যুতে প্রকাশ পায়। জীবনব্যাপী ভক্তিচর্চ্চার ফলে মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও হেরম্বচন্দ্র হরিনাম-রসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিতে প্রায়াস পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আমাকে ভগবানের নাম শুনাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পরে নিজেই বারংবার 'দুর্গানাম' এবং "ওঁতৎসৎ" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্তিমকালে তাঁহার প্রাণপক্ষী "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" গাহিতে গাহিতে ত্রিদিবাভিমুখে উড্ডীন হইল। এমন মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?" ভক্ত অশ্বিনীকুমার তাঁহার ভক্তিমান ছাত্রের এই যে ভাগবত ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন ইহা পাঠ করিলে হৃদয় পুলকিত হয় এবং ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে,—তিনি সেই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন যে-দৃষ্টি সর্ব্বদা এই বিশ্বভুবনে পরমেশ্বরের অনন্তলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এই দৃষ্টি যাঁহার থাকে তিনিই সীমার মধ্যে অসীমকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে মহৎকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

ভক্তিযোগ-ব্যাখ্যাতা অশ্বিনীকুমার তাঁহার ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বালকদের নিকট ভুক্তিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে বাল্যেই ভাগবত ভাব প্রকটিত হইয়াছিল। ভক্তি সাধনের পক্ষে বাল্যকালই তিনি উপযুক্ত সময় মনে করিতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের উক্তি অনুসরণ করিয়া তিনি বলিতেন—"ভক্তির বীজ বপন করিবে ত হৃদয়

কোমল থাকিতে থাকিতে কর। বাল্য বয়সে হৃদয় মাটীর মত কোমল থাকিতে থাকিতে ভক্তি বীজ বপন করা কর্ত্তব্য, পরে সংসারে পুড়িয়া সে মাটী ঝামা হইয়া গেলে ঝামায় কখন গাছ গজায় না।" অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন—"বিদ্যা উপার্জ্জন, ধনউপার্জ্জন সমস্তই ভগবানকে লইয়া করিতে হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যা অকর্ম্মণ্য, ধর্ম্মে মতি না থাকিলে বিদ্যা ও ধন ধূর্ত্ততা ও শঠতার পরিপোষক হইয়া দাঁড়ায়।" তাঁহার এই উক্তি তিনি স্বীয় জীবনে কার্য্যের দ্বারা আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি যে-কোন ক্ষেত্রে তিনি কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্যের মূলে ছিল ধর্ম্মবুদ্ধি। এক কথায় ভগবানকে লইয়াই তিনি সমস্ত কার্য্য করিতেন।

অশ্বিনীকুমারের মুখে যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের ভাবরসাত্মক বাক্য ও শ্লোকের ব্যাখ্যান শুনিয়াছেন তাহারা জানেন যে, যথার্থ প্রেমিকের মুখে এই সকল বাণী কি মধুর ও অর্থযুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার উচ্চারণের বিশুদ্ধতা, কণ্ঠের লালিত্য, ভাবের প্রাচুর্য্য শাস্ত্র-বাণীর সরসতা শতগুণে বাড়াইয়া দিত। ভক্ত অশ্বিনীকুমার দেশী ও বিদেশী ধর্ম্মশাস্ত্র ও ভক্তচরিত গ্রন্থ পরম আগ্রহ সহকারে চিরজীবন পাঠ করিয়াছেন। ধর্ম্মগ্রন্থের যে অংশ বা যে শ্লোক তাঁহার নিকট সুমধুর বিবেচিত হইত তিনি সেই সকল অংশ ও শ্লোক তাঁহার ছাত্র ও বন্ধুদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। যাহাদের সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার ছিল

তাহারা প্রায় প্রত্যেক পত্রেই এইরূপ উৎকৃষ্ট বাণী বা শ্লোক উপহার পাইতেন। সাধুভক্তদের ভাবমূলক বাণীসমূহ তিনি পাঠ, আলোচনা ও মনন করিতেন। তাঁহার ভক্তি-পিপাসু মন এইরূপ ভাবরাজ্যে বিহার করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিত।

অশ্বিনীকুমার কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধনা করিয়াছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সাধ্য আমাদের নাই। এই মাত্র বলা যায় ছোট শিশু যেমন মাকে 'মা' বলিয়া ডাকে তিনি তেমনি করিয়া পরমেশ্বরের নাম করিতেন। মাতৃস্তন্যপানরত শিশুর মত তিনি যেন জগজ্জননীর বক্ষ জড়াইয়া নিরন্তর আনন্দমধু পান করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি হরিনামে পাগল ছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি নাম জপ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন, ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে অসামান্য প্রেমের সঞ্চার হইত। তখন তাঁহার বুক কাঁপিত, পা টলিত, চক্ষে ধারা বহিত, তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন না। কীর্ত্তন সভায় তিনি কখন কখন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যাইতেন।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার বলেন, "বন্ধু বান্ধবের সহিত একত্র হইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সংকীর্ত্তন করার ন্যায় আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সত্য সত্যই তখন আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, বিষয়-বাসনা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য তিরোহিত হয়। ক্রমাগত নাম কীর্ত্তন

করিলে অবশ্যই মানুষ পরমপদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।” নামমধু পানে যে সকল ভাগ্যবান্ সাধক মাতিয়া যান্ তাঁহারা নাম গান করিতে করিতে কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখন ব্যাকুলচিত্তে চীৎকার করেন, কখন বা উন্মাদের মত নৃত্য করেন।

শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনে পাগল ভক্ত অশ্বিনীকুমার ভাবমূলক গান শুনিয়া কি আনন্দ সম্ভোগ করিতেন তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ভক্তসমাগমে তাঁহার গৃহ দিবারাত্রি নামগুণগানে টল্‌মল্ করিত। তাঁহার গৃহে একবার রামনিধি নামক এক অখ্যাত যথার্থ ভক্ত বাউলের সমাগম হইয়াছিল। তখন রামনিধির বয়স সত্তর বৎসরের অধিক। কিন্তু তাঁহার দীপ্তিপূর্ণ বৃহৎ চক্ষু, লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডল, বলিষ্ঠ বিশাল বপু দেখিয়া যে কোন যুবককে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইত। এই ভক্ত বাউল তাঁহার স্বরচিত ভাবসঙ্গীতে অশ্বিনীকুমারকে পাগল করিয়া দিয়াছিলেন। সেই নিরক্ষর নমঃশূদ্র বাউল গাহিয়াছিলেন—

প্রেমের গাছে রসের ঘটা পাতে যে জনা .
(ও তায়) নিত্যনতুন বেরয়গো রস খাইলে পর আর ফুরায়না।

বাউলের এইরূপ সঙ্গীত শুনিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার পূর্ণানন্দের আস্বাদন করিয়া আনন্দরসে ডুবিয়া যাইতেন। তাঁহার চারিদিকে রসস্বরূপ দেবতা প্রকাশিত হইতেন।

যে সকল ভক্তসঙ্গে অশ্বিনীকুমার কীর্ত্তনানন্দে মাতিতেন তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-মহাশয়ের নাম

বিশেষরূপে উল্লেখ করা যায়। গোস্বামী মহাশয় মধ্যে মধ্যে বরিশাল সহরে যাইতেন। যখন তাঁহার সঙ্গ লালসায় যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিত। ঐ সময় লাখুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী, পরলোকগত হরকান্ত সেন, উপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ভবনে বরিশাল সহরের ভক্ত-মণ্ডলীর কীর্ত্তনানন্দ চলিত। অশ্বিনীকুমার এই সকল ভক্ত-সঙ্গে মনের আনন্দে কত নৃত্য করিয়াছেন, ভাবাবেশে কত দশায় পড়িয়াছেন, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না। যাহারা অশ্বিনীকুমারকে ব্যঙ্গ করিয়া সুখানুভব করিতেন তাহাদের মধ্যে এই সময়ে এইরূপ একটি বাক্য প্রচলিত ছিল—

"ধর খোসাল চশ্‌মা জুড়ি
আমি একবার দশায় পড়ি।"

পরলোকগত খোসালচন্দ্র রায় মহাশয় তখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। কীর্ত্তনানন্দে তিনি অশ্বিনীকুমারের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন।

অশ্বিনীকুমার স্বরচিত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—"লুকান মাণিক তুল্‌বি যদি ডুব দে প্রেমসাগরের জলে।" ভক্ত অশ্বিনীকুমারের জীবন ছিল ভগবচ্চরণে নিবেদিত। তিনি তাঁহার শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চিত্তদ্বারা যাহা করিতেন সমস্তই প্রেমময় দেবতার চরণে নিবেদন করিতেন। প্রেমানন্দেই তিনি অহর্নিশ ডুবিয়া থাকিতেন। ভক্তিযোগে

এই প্রেমের চরম পরিণতি বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—এই প্রেমময় দেবতা—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং

এই বিভুর শরীর মধুর, মুখখানি মধুর মধুর মধুর, অহো ইহার মৃদুহাসিটি মধুগন্ধি, মধুর মধুর মধুর মধুর।

# অষ্টম অধ্যায়

## অন্তিম জীবন

সুদীর্ঘ চৌদ্দমাস কাল অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। এই কারাদণ্ড তাঁহার চিত্তের শান্তি ও মনের প্রসন্নতা নষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্তু এই সময়েই তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া যায় যে, তিনি আর কখনও দৈহিক স্বাস্থ্য পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। ভগ্ন-স্বাস্থ্য অশ্বিনীকুমার অন্তরে চির নবীন হইলেও এই সময় হইতেই তাঁহার আর পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম করিবার শক্তি রহিলনা।

নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজটির সত্তারক্ষার জন্য চেষ্টিত হন। গভর্ণমেণ্টের নূতন ব্যবস্থা অনুসারে কলেজ পরিচালনা বিলক্ষণ ব্যয় সাধ্য হইয়া উঠিল। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কলেজটিকে বাঁচাইয়া রাখা অসম্ভব বিবেচিত হইল। এই সময়ে অশ্বিনী-কুমার একবার বলিয়াছিলেন, "কলেজ তুলিয়া দেওয়া হউক।" কিন্তু হিতৈষী বন্ধুরা তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া জানাইলেন—"এইরূপ করিলে বাকরগঞ্জ জিলাবাসীর উচ্চশিক্ষা-লাভের পথ একরূপ রুদ্ধ হইবে।" অবশেষে গভর্ণমেণ্টের সহিত রফা হইল—"স্থির হইল কলেজের বিশেষত্ব রক্ষা

করিয়া সরকারের সাহায্যে ইহা চলিবে।” সরকারের সহিত এই অপোষ-নিষ্পত্তির সময়ে অশ্বিনীকুমারকে অনিচ্ছায় কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র এবং স্কুলের তিনজন শিক্ষককে বিদায় করিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—“মাতার মৃত্যুতে অশ্বিনীকুমার অশ্রু-মোচন করেন নাই, কিন্তু ইহাদিগকে বিদায় করিতে অশ্বিনীকুমার বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাঁহার Round Table এত দিনে সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়া গেল।” যে বিদ্যালয়টিকে মনের মত গড়িবার জন্য অশ্বিনীকুমার তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের প্রচুর শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যালয়টি এই সময়ে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। স্কুলটি কলেজ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বত্বাধিকারিগণের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে রহিল।

### ঢাকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি

১৯১৩ অব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির ঢাকা নগরীর অধিবেশনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সারগর্ভ উপাদেয় বক্তৃতায় তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সালিসী ও স্বদেশী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বক্তৃতা “The Indian Nation Builders” গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত বক্তৃতামধ্যে তিনি বলিয়াছেন—(১) লোকশিক্ষার দ্বারা আমাদিগকে এমন ভাবে জনমতের সৃষ্টি করিতে হইবে

যে, গভর্ণমেণ্ট যেন আমাদের কোন দাবীকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের দাবী বলিতে না পারেন। (২) এই দেশের জনমণ্ডলীর সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ এমনভাবে উন্নত করিতে হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট যেন জনসাধারণের প্রার্থিত কোন শাসনসংস্কারের দাবী অগ্রাহ্য করিতে না পারেন। সমগ্র পৃথিবী যেন এই কথাই বলিয়া উঠে, 'ইহারা যাঁহা দাবী করিতেছে, ইহারা সর্ব্বতোভাবে উহার যোগ্য।' এযাবৎ বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন আন্দোলনই জনসাধারণের চিত্তস্পর্শ করিতে পারে নাই। কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সে যে সকল প্রস্তাব অলোচিত হয় জনসাধারণ ঐ সকলের কোন সংবাদই রাখেনা। ইহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ইহার কোন প্রতিকারবিধানে আমরা এতদিন একান্ত উদাসীন হইয়া রহিয়াছি। উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে গ্রামে গ্রামে প্রচারক প্রে্রি.ত হইতে পারে।

এই বক্তৃতামধ্যে অশ্বিনীকুমার তখনকার অবিমৃষ্য খানাতল্লাসীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—একটি মাত্র পুলিশের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কোন ভদ্রলোকের বাড়ী খানাতল্লাস করা উচিত নয়। এইরূপ খানাতল্লাস করিবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট যেন অগত্যা ঐ বিষয়ে একজন প্রবীণ ভারতীয় ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের অভিমত গ্রহণ করেন। কিন্তু যাহারা স্বদেশের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী তাহাদের প্রত্যেকেরই নরহন্তা দস্যুদিগকে দণ্ডদান করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে

যথাসম্ভব সহায়তা করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে লোকসাধারণের মনে বোধের সঞ্চার করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত—

ধর্ম্ম অধর্ম্মকর্ত্তৃক শেলবিদ্ধ হইয়া সমাজের সমীপে সুবিচার পাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। সমাজ যদি ইহার প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে অর্দ্ধেক পাপের জন্য সমাজপতি দায়ী হইবেন; যাহারা নিন্দার্হ পাপকারীকে নিন্দা করেন না চতুর্থাংশ পাপ তাহাদের হইবে, পাপী কেবল অবশিষ্ট চারিভাগের এক ভাগের ফল ভোগ করিবে। কিন্তু বিচারে পাপী যদি দণ্ডিত ও নিন্দিত হয়, তবে সমস্ত পাপের জন্য সেই তখন দায়ী হইবে।

গ্রামের লোক চোর-ডাকাতের সন্ধান জানিলেও পুলিশের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই বলিয়া, উহাদের নামধাম তাহাদিগকে জানায় না। ভয় এই যে, পাছে পুলিশ তাহাদিগকেও ঐ মামলায় জড়িত করে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসীরা নিরস্ত্র, তাহাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, এইজন্য পুলিশের কাছে চোর ডাকাতের নাম বলিতে তাহাদের সাহস হয় না, পাছে চোর ডাকাতেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদেরই সর্ব্বনাশ করে।

এই বক্তৃতামধ্যে অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন—'মহারাষ্ট্র দেশের পয়সাভাণ্ডার অতি চমৎকার কার্য্য সাধন করিয়াছে।

বঙ্গদেশে কেন এইরূপ ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে না তাহা আমি বুঝিতেছি না? এইরূপ ভাণ্ডারের সংশ্রবে প্রত্যেক জিলার সদরে একটি সমিতি স্থাপিত হউক। সমিতি রেজিষ্ট্রীকৃত হইবে। সমিতির একদল পরিচালক থাকিবেন। তাঁহাদের মতানুসারে এইরূপ ভাণ্ডারের অর্থ নানাপ্রকার লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। সমস্ত জিলায় সমিতিগুলি ঠিক এক-প্রকারের হইবে এমন বিধান না হওয়াই ভাল। প্রত্যেক জিলায় তথাকার প্রয়োজন অনুসারে সমিতি নূতন নূতন রকমের হইতে পারিবে। প্রত্যেক সমিতি গ্রামে গ্রামে শাখাসমিতি স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবেন। প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে প্রত্যেক জিলাসমিতির রিপোর্ট পঠিত হইবে।

উক্তরূপে সমগ্রপ্রদেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

## রোগ ও দেশ-ভ্রমণ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ-কারাগার হইতে ভগ্নদেহ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কর্ম্মানুরাগী অশ্বিনীকুমার মনের অনুরাগে পূর্ব্ববৎ সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তাঁহার আর তেমন ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি ছিল না। ঢাকায় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে সভাপতির কার্য্য করিবার পরে তাঁহাকে দীর্ঘকাল রোগশয্যায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

স্বাস্থ্যোন্নতিমানসে এই সময়ে তিনি ভারতবর্ষের কয়েকটি স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ভক্ত অশ্বিনীকুমারের দেশভ্রমণের অসাধারণ অনুরাগ ছিল তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, প্রস্রবণ প্রভৃতির আশ্চর্য্য শোভা দেখিয়া তিনি পরম আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার লীলা দেখিয়া তিনি ভাবে বিহ্বল হইতেন। তীর্থদর্শন ত তাঁহার নেশার মধ্যে গণ্য হইতে পারে। হিমগিরি হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল তীর্থ অশ্বিনীকুমার দেখিয়াছেন, ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের মধ্যে একমাত্র কাশ্মীর তিনি দেখেন নাই।

সৌখীন ভ্রমণকারীরা যেমন অল্প সময়মধ্যে বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া পর্য্যটন-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন অশ্বিনী-কুমারের দেশভ্রমণ ঠিক সেইরূপ দৃশ্যদর্শনের সৌখীনতা নহে। তিনি যেখানে যাইতেন দীর্ঘকাল তথায় থাকিয়া সেই স্থানের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া তাবৎ দর্শনীয় বিষয় দেখিয়া আসিতেন। এইরূপ ভ্রমণকালে তিনি ভারত-বর্ষের নানা প্রদেশের ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। হিন্দি, আরবী, ফারসী, উর্দ্দু, মারাঠি, গুরুমুখী প্রভৃতি বহু ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে টিলকের মতানুবর্ত্তন করিতেন। মহামতি টিলক সম্পাদিত 'কেশরী' পত্রিকা পড়িবার জন্য তিনি মারাঠীভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ভগ্নস্বাস্থ্য অশ্বিনীকুমার এই সময়ে রোগশয্যায় তাঁহার রচিত 'কর্ম্মযোগ'' গ্রন্থের রচনাকার্য্য সমাপ্ত করেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অশ্বিনীকুমার বরিশালে প্রত্যাগমন করেন।

## শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী সমিতি

কর্ম্মী অশ্বিনীকুমারের পক্ষে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকা অসম্ভব ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বরিশালজিলাবাসীর সেবার জন্য 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী সমিতি' স্থাপন করেন। তিনি এই সমিতির সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। এই সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অশ্বিনীকুমার বার্ষিক তিনশত টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই সমিতির প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত হইয়া থাকে। সমিতির প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া লোকসাধারণকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এই সমিতির জন্য অশ্বিনীকুমার তাঁহার ভাঙ্গা দেহ লইয়া অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে বরিশাল হইতে বহুদূরে স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হইত। সুতরাং এই সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধাশীল যুবক কর্ম্মীদের উপর নির্ভর করিতে হইত।

এই সমিতির সংশ্রবে তিনি ১৩২৪, ১০ই ভাদ্র, কাশীধামের রাণামহল হইতে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে লিখিয়াছেন—

তোমার দিকে না তাকাইয়া, বাবা, কাহার দিকে তাকাইব? বাস্তবিকই তোমাকে ভরসা করিয়া আছি। খাটিতেছ আরও খাটিতে হইবে। 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধায়িনীর' জন্য তুমি প্রাণপণ না খাটিলে হইবে না। বরিশাল হইতে কেবল নিরাশার ধ্বনি আসিতেছে। অমন জিনিষ মাটি হইতে দিও না। ভেগাইর প্রাপ্য সকল টাকা কি দেওয়া হইয়াছে? তোমার বাড়ী বাড়ী যাইয়া টাকা আদায় করিতে হইবে। চাঁদার হার কমাইয়া ১২৲ টাকা করিয়া, চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সুবিধা হইলে তাহা কর, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু জাকাইয়া তোলো। ললিত তার মজুরিতে নেহাৎ ব্যস্ত, সময় পায় না। বাবা, তোমাকেই বিশেষ ভাবে লাগিতে হইবে। বুড়া যেন কাঁদিতে কাঁদিতে না মরে, এদিকে দৃষ্টি রাখিও। আর কি লিখিব? কর্ত্তা তোমাদের বল ও স্ফূর্ত্তি দিন।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীঅ:

এই সমিতির সংশ্রবে ১৩২৪, ৬ই আশ্বিন, কাশীধাম হইতে আর এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন :—

রমেশ, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি যে "শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনীর" কার্য্যে মন দিয়াছ তাহাতে বড়ই প্রীত হইয়াছি। তুমি চেষ্টা করিলে যথেষ্ট চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারিবে। তোমার প্রতি লোকের ভক্তি আছে। কত

তুলিতে পারিয়াছ জানাইবে। ললিত এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। শরীরটা আজকাল বেজায় মন্দ বলিয়া উত্তর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। আশা করি, শীঘ্রই লিখিব। যাহা ভাল বোধ কর তোমরাই করিবে। বাবাজী, অমন ভাল কাজ আর নাই। আমার টাকা জানুয়ারীর মাঝামাঝি পাইবে। ও টাকাটা পুকুরাদির সাহায্যের জন্য রাখাই ভাল মনে হয়।

এবার পূজায় কোন্ দিকে যাইবে? গ্রামে গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনীর জন্য ঘুরিলে ভাল হয় না? ইহাতে তোমাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আসিবে। ললিতেরও বাহির হওয়া উচিত।

আছত ভাল? অপর অধ্যাপক বন্ধুগণ ভাল আছেন ত?

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীঅঃ

## লাঞ্ছিতের স্মৃতি

স্বদেশীর সেই গৌরবময় যুগে পুলিশের লাঠির ঘায়ে বরিশাল "পুণ্যে বিশাল" হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজা বাহাদুরের হাবিলী স্বদেশভক্ত মহাত্মাদের লাঞ্ছনার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া স্বদেশীর পুণ্যময় তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এই স্মৃতিরক্ষার জন্য অশ্বিনী-কুমারের প্রচেষ্টায় ভিক্ষালব্ধ অর্থে রাজাবাহাদুরের হাবিলীতে

এক টাউন হল নির্ম্মিত হইয়াছে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর পরে উক্ত টাউন-হল নির্ম্মাণ শেষ হইলে উহা তাঁহার নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

## দরিদ্র নারায়ণের সেবা

১৯১৯ অব্দে প্রবল ঝটিকায় বরিশাল জিলাবাসী সহস্র সহস্র নরনারী অকস্মাৎ গৃহহীন ও নিরন্ন হইয়া পড়ে। যে মুহূর্ত্তে এই সেবার আহ্বান উপস্থিত হইল তৎক্ষণাৎ ভগ্নদেহ বৃদ্ধ অশ্বিনীকুমার দরিদ্র নারায়ণের সেবার নিমিত্ত ভিক্ষাপাত্র হস্তে বাহির হইলেন। তিনি তাঁহার অনুরাগী শিষ্যদের দ্বারা আবশ্যক মত কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাহায্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে পাঞ্জাব, বোম্বাই, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থল হইতে বহু অর্থ ও বস্ত্রাদি আসিয়াছিল।

## অসহযোগ আন্দোলন

অশ্বিনীকুমার উচ্চাভিলাষী চিন্তাশীলব্যক্তি, তাঁহার মনে স্বদেশের গৌরবময় ভবিষ্যৎ সর্ব্বদা জ্বল্ জ্বল্ করিত। এই আদর্শের অনুসরণে পিছাইয়া পড়িয়া তিনি কদাচ নিন্দিত হন নাই। ১৯২০ অব্দে যখন কলিকাতার জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধির পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন অনেকেই ঐ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের বলিষ্ঠ মন সেই প্রস্তাবে আনন্দিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের

তখন কার্য্য করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু তিনি অসহযোগ আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়ে বরিশালজিলাবাসী এই আন্দোলনে সাড়া দিয়াছিল।

## বরিশালে প্রাদেশিকসমিতি

চারিদিকে যখন অসহযোগ আন্দোলনের জয়ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল সেই উত্তেজনার মধ্যে ১৯২০ অব্দে ইষ্টারের ছুটীর সময়ে বরিশালে আবার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। এবারও অশ্বিনীকুমার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইলেন। মনীষী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই সমিতির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি তখনকার সাময়িক উত্তেজনার উর্দ্ধে উঠিয়া সারগর্ভ বক্তৃতায় স্বীয় দূরদর্শনের ও রাজনীতিক অভিজ্ঞতার অমোঘ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এইবার বরিশালের প্রাদেশিক সমিতি নেতৃবৃন্দের অত্যুগ্র মতবিরোধের জন্য স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

## ব্রজমোহন বিদ্যালয়

এই সময়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালবাসী জনসাধারণের অনুরোধে ব্রজমোহন স্কুলকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করেন।

## ষ্টীমার কোম্পানীর ধর্ম্মঘট

১৯২২ অব্দে চা-বাগানের কুলীদের প্রতি অত্যাচার হেতু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম রেলওয়ে ও ষ্টীমারে ধর্ম্মঘট হয়। বরিশালের ধর্ম্মঘটকারীরা অশ্বিনীকুমারকে তাহাদের পরামর্শ সভার সভাপতি বরণ করে। রোগশয্যাশায়ী অশ্বিনীকুমার ধর্ম্মঘটকারীদিগকে সাধ্যমত সদুপদেশ দ্বারা উপকৃত করিয়াছিলেন। অতঃপর অশ্বিনীকুমারের বহুমূত্র ব্যাধির প্রকোপ বৰ্দ্ধিত হইল, তিনি তাঁহার সাধের কর্ম্মভূমি বরিশাল ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা ভার গ্রহণ করেন।

## চিত্তের স্ফুর্ত্তি ও চিরবালকত্ব

পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমারের জীবনদীপ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে লাগিল। ব্যাধির খরশরে তাঁহার দেহের বল, কর্ম্মের শক্তি নিঃশেষপ্রায় হইল কিন্তু তাঁহার সদাপ্রসন্ন মুখের মধুর হাসি, চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও বাক্যের সরসতা কিছুতেই দূর হইল না। মৃত্যুকালেও যেন তিনি তাঁহার অফুরন্ত হাসির মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ অসুস্থতার মধ্যে তিনি একখানি আশীর্ব্বাদ পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন—

স্নেহাস্পদেষু

শরৎ, তোমার বিজয়াসম্ভাষণ অনেকদিন হইল পাইয়াছি। কিন্তু প্রাপ্তি স্বীকার করিতে যে টুকু পরিশ্রমের

প্রয়োজন তাহা করে কে? এখন বড়ই দুর্ব্বল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী যথাসময়ে পাইয়াছিলাম কিন্তু এখনও পড়ি নাই। আজ কাল আছি এই মাত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় দেহ "অস্তীতি বস্"। আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বদা মনে রাখিও—

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণব-শোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোক যশোঽনুগীয়তে॥

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅঃ

অশ্বিনীকুমারের আনন্দ, হাস্যকৌতুক ও বালসুলভ চটুলতা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তই সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। বাহিরে তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে ছিলেন তিনি চির-নবীন। তাঁহার এই চির-বালকত্ব, চির-সরসতা তদীয় জীবনব্যাপী ধর্ম্মসাধনারই ফল। অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া যাহা গাহিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও উহা সত্য। তিনি স্বরচিত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—

কোন দিন কি ফুরাবে না পনর বছর তোর?
কখন না বুড়ো হবি রহিবি কিশোর?

তোর ঐ রূপ রাশি
ললিত মোহন মধুর হাসি
কেমন প্রাণ করে উদাসী
জানিস্ মনচোর।
থাক্ থাক্ এমনি থাক্
চিরদিন মজিয়ে রাখ
প্রাণ থাক্ হয়ে অবাক্
ঐ রূপেতে ভোর!

সুরসিক অশ্বিনীকুমারের রসের উৎস ছিল কোথায় এই সঙ্গীতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অফুরন্ত হাসি, সরসবাক্য ও রঙ্গপরিহাস সকলের মন হরণ করিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি সরস বাক্যালাপে মানুষকে মাতাইয়া রাখিতে পারিতেন। এমন সুরসিক আসর-জমানো মজার মানুষ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

যিনি যথার্থ রসিক অন্যের বাক্যের প্রকৃত রস গ্রহণের ক্ষমতা তাঁহার যেমন থাকে, অরসিকের তেমন থাকে না। একদা ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় বি,এ পরীক্ষার্থীদের বাছনি পরীক্ষায় স্বরচিত একটি চতুর্দ্দশপদী ইংরাজী কবিতা ব্যাখা করিতে দিয়াছিলেন। উহাতে লিখিত হইয়াছিল, অশ্বিনীকুমার যদি বরিশাল সহরে Little Brothers of the Poor দল গঠন না করিয়া Big Brothers of the Rich দল গঠন করিতেন তাহা হইলে চির-অমরতা লাভ করিতে

পারিতেন। এক সহৃদয়-বৃদ্ধ শিক্ষক ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিষয়টি অভিযোগের আকারে অশ্বিনীকুমারের নিকট উপস্থিত করেন। অশ্বিনীকুমার উহা শুনিয়া হাসিয়া অধীর হইলেন। তিনি বলিলেন—ঠিক লিখিয়াছে—a master piece of humour, অতি উৎকৃষ্ট রসিকতা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃত্যুর অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে রোগের প্রকোপে যখন তিনি বিস্মৃতিহেতু বন্ধুবান্ধবদের বাক্যের উত্তর ঠিক গুছাইয়া বলিতে পারিতেন না, তখনও রসিকতার শেষ ছিল না। তখন হাসিতে হাসিতে বলিতেন—"ভক্তিযোগ হ'য়ে গেছে, কর্ম্মযোগ ও সারা, এখন হচ্চে গোলযোগের পালা।"

রস-স্বরূপ পরমেশ্বর যাঁহার হৃদয়ের আনন্দ, তাঁহার চিত্তের সন্তোষ ও মুখের প্রসন্নতা কি প্রকারে দূর হইবে? স্ফূর্ত্তি মন্ত্রের উপাসক অশ্বিনীকুমারের স্ফূর্ত্তি গেল না, কিন্তু তাঁহার প্রাণপক্ষী জীর্ণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্তগগনে উড্ডীন হইবার জন্য উন্মুখ হইল। ভবানীপুরের ৫৯, চক্রবেড়ে রোড্ নর্থ সংখ্যক বাড়ীতে অশ্বিনীকুমার অন্তিম শয্যায় অনেক দিন শায়িত ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও অভ্যাগত বন্ধুদের সমাগমে এই ভবন ধর্ম্মশালায় পরিণত হইয়াছিল। রোগশয্যাশায়ী অশ্বিনীকুমারকে দেখিবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্যাটেল,

পণ্ডিত মতিলাল নেরু ও হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ বহু দেশহিতৈষী ব্যক্তি তাঁহার ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। ধূপ যেমন আপনাকে দহন করিয়া গন্ধ বিতরণ করে অশ্বিনীকুমার তেমনি একটু একটু করিয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে দেশের কাজে দান করিয়াছেন। অবশেষে ১৯২৩ অব্দের ৭ই নবেম্বর ৬৭ বৎসর বয়সে ভক্ত ও কর্ম্মী অশ্বিনীকুমারের জীবন-প্রদীপ চিরনির্ব্বাপিত হইল।

এই ভগবদ্ভক্ত যেমন জীবনে তেমন তাঁহার মৃত্যুতেও কিরূপ ভাগবত লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত সুকুমার দত্ত ভক্ত অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর বিবরণ নিম্নলিখিত-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

আনন্দ ছিল তাঁহার জীবনের মূলসূত্র। মৃত্যুশয্যায় ও শ্মশানযাত্রায় সেই সূত্রই চলিয়াছিল। ২১এ কার্ত্তিক, বুধবার, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। পূর্ব্বদিন রবিবার হইতেই প্রায় জ্ঞানশূন্য হন। শনিবার দ্বিপ্রহরে একা শুইয়া অনবরত হাত তালি দিতেছিলেন। আমার দিদি কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি হাততালি দিতেছেন কেন?' তিনি অস্ফুটস্বরে উত্তর করিলেন—'কি জানি আমার বড়ই স্ফূর্ত্তি লাগিতেছে। তুই আমাকে একটু দাঁড় করাইয়া দিতে পারিস্? আমি একটু নাচি, আমার বড়ই স্ফূর্ত্তি বোধ হইতেছে।' তাঁহার তখন বসিবার শক্তিও ছিল

না। বারংবার তিনি আনন্দের আবেগে দাঁড়াইয়া নাচিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। দিদি তাঁহাকে একবার চটিজুতা পায় পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আবার খুলিয়া রাখিলেন। তখন দুই পা ভয়ানক ফুলা, জুতা পায় লাগিল না। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"জানিস্ দুপুর দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কে যেন আমার বুকের উপর ক্রমাগত নাচিতে থাকে, আমার বুকটা ক্রমাগত তালে তালে নাচে, আমি নাচিতে চাই পারি না।" এই তাঁহার শেষ কথা। পিসিমার মুখে শুনিয়াছি সোমবার দিনও নাকি দুপুর বেলা ঐরকম হাততালি দিতেছিলেন এবং একটু একটু হাসিতেছিলেন। মঙ্গলবার দিন রাত্রে একবার হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"এবার আর বাঁচা গেলনা।" বুধবার অপরাহ্ণ তিনটা বাজিবার পাঁচ মিনিট থাকিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগের মিনিট পাঁচেক পূর্ব্বে ডান দিকে পাশ ফিরিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া পাশ বালিশ কোলে লইয়া খুব আরামে যেন শয়ন করিলেন। একবার সমস্ত চক্ষু দুইটি মেলিয়া পূব আকাশের দিকে খানিক ক্ষণ চাহিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। আর চক্ষু খুলেন নাই, সেই ভাবেই প্রাণবায়ু নির্গত হইল।

তাঁহার কোষ্ঠিতে নাকি গঙ্গাতীরে শেষ অবস্থান লেখা ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ঐ কথা বলিতেন। এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কাশী যাইবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় উপদেশ দিলে কাশী লইয়া যাইব

এই আশ্বাস দিয়া গত বৎসর ( ১৩২৯ ) তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসি। ডাক্তার সরকার তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় রাখিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে কিছু সুস্থ হইলে কাশী বা পুরী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। আমি নানা ছলছুতা করিয়া থামাইয়া রাখিতাম। সে যাহা হউক, গঙ্গাতীরেই তাঁহার শেষ অবস্থান হইল। কালীঘাটের কেওড়া তলা মহাশ্মশানের প্রাচীরের বাহিরে আদিগঙ্গার পবিত্র স্রোত-ধারার মাত্র দশ বারো হাত দূরে একটি 'রেইনট্রি' গাছের তলায় তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষ রহিয়াছে।

যিনি সারাজীবন 'স্ফূর্ত্তি' মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, তাঁহার জীবনের অবসানও ঘটিল বাজি-বাজনা ও দেওয়ালির উৎসব আমোদের মধ্যে। বুধবার দিন রাত্রি বারোটার পরে অমাবস্যা তিথি—কালীপূজা। রাত্রি আট ঘটিকার সময় যখন বিরাট্ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার ত্যক্ত দেহ বহন করিয়া গঙ্গা-তীরের দিকে লইয়া চলিলাম তখন আলোর মালায় কলিকাতার রাজপথগুলি আলোকিত হইয়াছে।

চারিদিকে নানারংএর পতাকা ও পত্রপুষ্পের সজ্জা। কেওড়া তলার শ্মশান পত্র-পুষ্পের পতাকায় সুসজ্জিত। আমরা প্রবেশ দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র উপরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল, বাজি-বাজনায় সমস্ত শ্মশান-ভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল, উৎসবের সোর-গোল পড়িয়া গেল। মৃত্যুশয্যায় ও শ্মশানে তিনি তাঁহার গানের যথার্থতা দেখাইলেন—

যখন আস্‌বে সময় যাবে বেলা
ফুরাবে এই ভবের খেলা,
ডুবে যাব হাসির মাঝে ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাই তাই।

লীলাময়ের এই বিশ্বময় হাসির মধ্যে "ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাই তাই" করিতে করিতে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন। আর যিনি জনসাধারণের প্রাণের প্রাণ ছিলেন, মুচিমেথর-চণ্ডাল জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে যিনি কোল দিতেন, সেই জনসঙ্ঘের নেতা, গণতন্ত্রের সাধক, সকল কথার সার কথা, তাঁহার প্রাণের কথা বলিয়া গিয়াছেন—

"সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পন্থা নাই"

অশ্বিনীকুমারের দেহ তাঁহার প্রিয় কর্ম্মভূমি বরিশালে লইয়া যাওয়ার অভিপ্রায় কোন কোন বন্ধু ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা হয় নাই। অশ্বিনীকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সরলকুমার এই সময়ে এক পত্রে বরিশালে কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

জ্যেঠামহাশয় গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহ রক্ষা করিতে বলিতেন। বড় মারও (অশ্বিনীকুমারের পত্নী) সেই ইচ্ছা। আমি তবুও বরিশাল লইয়া যাওয়ার জন্য তাল করিতে-ছিলাম। বড় মা এত অস্থির ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে ডাক্তারেরা তাঁহাকে অভুক্ত অবস্থায় বরিশাল লইয়া যাওয়া আশঙ্কাজনক মনে করেন। বাড়ীতে সকলেই পরশু রাত্রিতে খাওয়ার পরে আজ দশটায় খাইয়াছে। গতকল্য সমস্ত দিন ও

রাত্রি কেহ জলস্পর্শও করে নাই। রেলে মৃতদেহ লইয়া যাওয়ার অনুমতি যখন আসে তখন রাত্রি আটটা। ৺কালী-পূজায় সকল স্থান বন্ধ থাকায় মিস্ত্রী পাওয়া যায় নাই; বাক্স তৈয়ার করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই সাড়ে নয়টায় রওনা হইতে কিছুতেই পারা যায় নাই।

বরিশালের জন্য চিতাভস্ম, শবদেহ হইতে ফুল ও মাথায় দেওয়া একটা বালিশ লইয়া আসিতেছি। সোমবার আমরা রওয়ানা হইব। মঙ্গলবার পঁহুছিব।

বরিশালবাসী জনমণ্ডলী তাঁহাদের হৃদয়ের রাজা, নয়নের মণি অশ্বিনীকুমারের মৃতদেহ দর্শন করিবার সৌভাগ্যসুখে বঞ্চিত হইল। তাহারা হৃদয়-গলা অশ্রুর দ্বারা তাঁহার তর্পণ করিল। দেহভস্ম লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া বরিশালবাসী জনমণ্ডলী মনের ক্ষোভ নিবারণ করিল। সমগ্র নগর শোকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। যে কিরীট শিরে ধারণ করিয়া বরিশাল গৌরবান্বিত হইয়াছিল, এতদিনে তাঁহার মস্তক হইতে সেই কিরীট খসিয়া পড়িল। মানুষ চলিয়া যায় থাকে তাঁর স্মৃতি। অশ্বিনীকুমার চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মহৎজীবনের স্মৃতি রহিয়াছে। বরিশাল এই স্মৃতির উজ্জ্বল প্রভায় মণ্ডিত থাকিবে।

# নবম অধ্যায়

## শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯২৩ অব্দের ৭ই নবেম্বর দেশপূজ্য মহাত্মা অশ্বিনীকুমার কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে ৫৯, চক্রবেড়ে রোডে প্রাণত্যাগ করেন। কলিকাতা নগরের সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই পূতচরিত্র মহাত্মাকে শেষবার দেখিবার জন্য কেওড়াতলার মহাশ্মশানে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ বহুবিশিষ্ট ব্যক্তি ও শত শত নরনারী শ্মশানে মহাত্মা অশ্বিনী-কুমারের পদস্পর্শ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। পরদিন ৮ই নবেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার সম্পাদিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—

Aswini Kumar Dutt whose death we have to chronicle with unspeakable sadness of heart had no peer in the whole of Bengal in the higher qualities of man. His soul was like a star that shone apart but his heart was so near to man that he won the confidence and the affection of all who came into contact with him. It is hardly possible to exaggerate the influence of teachings and the example of his life on the present generation of his countrymen. In all Bengal his personality was the centre that radiated far and wide the spirit of service and truth. To him gravitated the yearning and loving hearts of a generation of men, young and old, for light and lead. No name was held in more reverence and none was more associated with all that is great, noble

and uplifting. He was not a Sanyasi as ordinarily understood,' but no Sanyasi had made self-abnegation the rule of his life to the extent that Aswini Kumar did. He was not a saint, but no saint had ever shed about him a holier light than Aswini Kumar. He was no politician, but none had exercised so potent an influence to spiritualise politics as he.

He was the very embodiment of truth and sincerity and his religious fervour exercised an influence far beyond the bounds of his province. His immortal book *Bhaktiyoga* (the path to devotion) which has passed through many editions and has been translated into English, has moulded the life of countless men and women.

His great organising powers found magnificent expression in the field of social service. The distress of humanity had an irresistible call on his heart. Undeterred by any difficulty he would rush to the rescue.

A recluse by temperament who shunned publicity like poison, he had never failed to respond to the call of his country when the country required his services for the furtherance of any movement for the assertion of national honour or the battle for national freedom. Thus the antipartition agitation found him a staunch champion of the people's cause and a fearless fighter He was deported under Regulation III of 1818 for his activities. Yet again when the non-co-operation movement was inaugurated, stricken as he was by serious illness, he gave his blessings to it and regretted

that he could do no more. We do not know when, if ever, the void caused by his death will be filled. But the memory of his great life will ever be the pole-star to the nation to guide it in the path of truth and righteousness.

১৯২৩ অব্দের ৯ই নবেম্বর শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বেঙ্গলি পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—

If there was a public man and politician of whom it could be said that he was of "soul sincere—in action faithful, and in honour clear ; who broke no promise, served no private end, who gained no title and who lost no friend," he was Babu Aswini Kumar Dutta of Barisal, whose mortal frame was put on the funeral pyre in Calcutta on Wednesday last. Not many are the names in the more recent history of this province which are more revered than that of Babu Aswini Kumar ; and we at least know of not many who have equalled him in quiet, unostentatious solid work for the uplift of the people. His name had, for long, been a household word in his own district ; and it became a household word in Bengal, at the time of the Partition and Swadeshi agitation. Smarting under a grievous wrong, Bengal declared the boycott of British goods in one united voice, and Aswini Kumar threw himself into the work at once. How he carried out the boycott almost to perfection in his district in the face of tremendous difficulties, and in spite of ill-health was at that time the one talk of the people of Bengal. He put superhuman energies for the accomplishment of the will of

Bengal and his efforts were crowned with success. There was a time when it was difficult to find one piece of 'bilati' cloth in his district. His achievement made him the observed of all observers, and the most admired of all the admired workers of his Province. But Barisal soon became an eye-sore of the Government and this led him to an unknown goal in 1908. Such is the abnormality of the circumstances under which we live that his very virtues were turned against him. His powers of organisation were looked upon with distrust, and his school, which had extorted the admiration of a host of English officials, was believed to be a breeding ground of sedition. "I do not wish to discourage, far less to abolish, an institution of this kind," wrote Sir Andrew Fraser in 1904 of the Brajamohan Institution ; but this was exactly the school for whose very existence Babu Aswini Kumar had to struggle hard with the Government of East Bengal in 1906 and 1907. Sir Bamfylde Fuller said of him that he was "not one of "those who render to their country lip-services only;" and Sir Valentine Chirol, (then Mr.), admitted in the columns of the "Times" that there was no grouud for deporting him under the Bengal Regulation III of 1818.

১৯২৩, ৮ই নবেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার' পত্রিকা লিখিয়াছেন—

India is distinctly poorer to-day by the death of this self-less patriot. He was a tower of strength to the Indian Nationalists who held him in great esteem and reverence. The secret of Aswini Kumar's

wonderful popularity in the country lay in his character. Simple and unostentatious he abhorred all sorts of self-advertisement and self-aggrandisement. All his thoughts and cares were directed towards the uplift of his countrymen. His message to his countrymen was the message of love and service. Piety and devotion to duty were the essence of his character. He had the courage of his convictions and never wavered or falterd in the pursuit of what he regarded as his duty. He devoted all his wealth and learning to the service of humanity.

Babu Aswini Kumar held a unique position among the Nationalists of the country The people of Barisal rich or poor, hung on his words ; such indeed was the magic power of his unselfish character. The death of Babu Aswini Kumar Dutta is an irreparable loss to the country and to the cause of Indian nationalism and "Swaraj" of which he was justly regarded as a high priest.

১৩৩০, ২৩এ কার্ত্তিক, শুক্রবারের "দৈনিক বসুমতী" লিখিয়াছেন—অশ্বিনীকুমার যে বাঙ্গালীর নমস্য ছিলেন, সে তিনি বিদ্বান্ বলিয়া নহে, সে তিনি বাগ্মী বলিয়া নহে, সে তিনি সাহিত্যিক বলিয়া নহে, সে তিনি বিদ্যাবিতরণকারী বলিয়া নহে, সে তিনি রাজনৈতিক বলিয়া নহে, সে তিনি জনসেবক বলিয়াও নহে। তিনি বাঙ্গালীর নমস্য—তাঁহার চরিত্রের জন্য। তাঁহার সেই চরিত্রই সকল কাজের উৎস ছিল—তাঁহার কর্ম্মবহুল-জীবনের কর্ম্মশক্তির কেন্দ্র ছিল। যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু অন্যায়, যাহা কিছু অধর্ম্ম, যাহা কিছু জাতীয় জীবনের প্রতিকূল, তাহাই অশ্বিনীকুমার ঘৃণায় পরিত্যাগ করিয়া সত্য ও ধর্ম্মের দিকে

অগ্রসর হইতেন। তিনি লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া দেশসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তাই তাঁহার কাছে আত্মপর ভেদ ছিল না। তাঁহার স্নেহের খনি হৃদয়ে সকলেরই জন্য স্নেহ সঞ্চিত থাকিত এবং তিনি অকাতরে সকলকে সেই স্নেহ দিতেন। আমাদের মত যাঁহারা কোনদিন তাঁহার সে স্নেহের স্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা কখনই তাহা ভুলিতে পারিবেন না। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে দীনবন্ধু যাহা লিখিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়—

"একদিন তাঁ'র সাথে করিলে যাপন,
দশদিন ভাল থাকে অবিবেকী মন।"

আজ যখন দেশে আন্তরিকতার একান্ত অভাব লক্ষিত হইতেছে, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘর্ষে দলাদলির উৎপত্তি হইয়া জাতীর সম্মানজ্ঞান ভাসিয়া যাইতেছে, যখন মনোবিবাদের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গদেশকে অধঃপতনের পথে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন অশ্বিনীকুমারের মত প্রকৃত জন-নায়কের—জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধ, চরিত্রবলে বলী, বঙ্গমাতার সুসন্তানের তিরোভাব যে বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া শ্রদ্ধেয় 'প্রবাসী'সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"এক অধিবেশনে কোথায় মনে পড়িতেছে না—তিনি অনেক স্বদেশভক্তকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের নন্দলালের সহিত তুলনা করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা এখনও আমার মনে আছে। কিন্তু তিনি নন্দলাল জাতীয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। এইজন্য তিনি নিজেকে বাঁচাইয়া দেশসেবা জনসেবা করিতেন না সেই কারণেই তিনি নির্ব্বাসিত হন। বিধাতার কোন বিধি কিংবা ব্রিটিশ প্রভুদের কোন আইন লঙ্ঘন করায়

তাঁহার নির্ব্বাসন হয় নাই। নির্ব্বাসন হইয়াছিল এইজন্য যে, বরিশালে তাঁহার প্রভাব উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীর প্রভাব অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল এবং এই প্রভাবের বশে বিস্তর ত্যাগী, সাহসী ও প্রেমিক জনসেবকের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই প্রভাবের একমাত্র কারণ তাঁহার অকপট মানব প্রেম ও অক্লান্ত জনসেবা।"

১৩৩০, ১লা অগ্রহায়ণ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় মির্জ্জাপুর পার্কে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় প্রায় সাত সহস্র লোক মহাত্মার স্মৃতিপূজার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী মনীষী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই শ্রাদ্ধবাসরে পরলোকগত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন করিয়া একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"অশ্বিনীকুমার যথার্থ কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মোদ্যমের মূলে ছিল ভগবদ্প্রীতি। সেই স্বদেশীর যুগে আমি যখন কারাগার হইতে বাহির হইলাম, যখন সমগ্র দেশ আমার জয়গানে মুখরিত, যখন সর্ব্বত্র আমি সাদরে অভিনন্দিত হইতেছিলাম, তখন একমাত্র অশ্বিনীকুমারই সাবধান বাণী শুনাইয়া ছিলেন। তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—ভাই, সমস্ত কল-কোলাহলের মধ্যে যাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছ, যাঁর কৃপায় এই সম্মান লাভ করিতেছ, তাঁহাকে যেন ভুলিও না।" ইহা হইতে বুঝা যায় অশ্বিনীকুমার যথার্থ কর্ম্মযোগী ছিলেন, প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি তিনি চাহেন নাই।

১৩৩০, ২৩এ কার্ত্তিক, শুক্রবারের 'বরিশাল' পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে—অশ্বিনীকুমার বরিশালের কি এবং বরিশাল অশ্বিনীকুমারের কি, সেকথা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। অশ্বিনীকুমার সত্যই বরিশালের

যুগান্তব্যাপী তপস্যার ফল। বরিশালের মূর্ত্ত শিক্ষা ও সাধনা। বরিশালের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু অশ্বিনীকুমার বরিশালের রাজা ছিলেন। বরিশালের সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ হিন্দুমুসলমানের নিকটে তাঁহার বাক্য শাসনবাক্য বলিয়াই মান্য হইত। সে বাক্যের বিরুদ্ধে চলিবার কাহারও প্রবৃত্তিই জন্মিত না। বাঙ্গালায়, ভারতবর্ষে বরিশালকে সকলেই চিনে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, বরিশালকে পুণ্যভূমি বলিয়া ধারণা করে, বরিশালকে জাগ্রত শক্তির উৎস বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখে, কারণ বরিশাল অশ্বিনীকুমারকে জন্ম দিয়াছিল, বরিশাল অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মভূমি হইয়াছিল। বরিশালকে অশ্বিনী-কুমার চিনিয়াছিলেন, জানিয়াছিলেন, ভালবাসিয়াছিলেন, পূজা করিয়া-ছিলেন। তাই অশ্বিনীকুমার বলিলে বরিশাল এবং বরিশাল বলিলে অশ্বিনীকুমারকে বুঝায়। অশ্বিনীকুমার বরিশালের সৃষ্টি এবং বরিশাল অশ্বিনীকুমারের সৃষ্টি, অশ্বিনীকুমার ও বরিশাল অভিন্ন। কাঁদ বরিশাল, যাঁহার নামে তোমার নাম, যাঁহার প্রতিষ্ঠায় তোমার প্রতিষ্ঠা সেই বরণীয় পুরুষের বিয়োগব্যথায় আজ শেষ কাঁদা কাঁদিয়া লও।

বরিশালের আজ অশৌচ, আজ গুরু-দশা। প্রেত তর্পণ করিতে হইবে। ২৬ লক্ষ বরিশালবাসীর আজ পিতৃতর্পণ, গুরুতর্পণ করিতে হইবে। পাঁচ কোটি বাঙ্গালীকে আজ জাতীয় জীবনের প্রধান পুরোহিতের অন্তিম তর্পণ করিতে হইবে। পরলোকগত এই মহাত্মার বরণীয় গুণরাজি স্মরণ ও মনন করিয়া বরিশালবাসী, বঙ্গদেশবাসী, ভারতবাসী নরনারী বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হউন।

গ্রন্থকার প্রণীত

## আর কয়েকখানি পুস্তক